ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

৬২ বর্ষ ৩১ সংখ্যা ।। ১৪ চৈত্র ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ২৯ মার্চ, ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

মুসলিম সংরক্ষণ

বামুন চিনি পৈতা প্রমাণ

সুমিত চক্রবর্তী।।। 'যাবার সময় হলো বিহঙ্গের। এখনই কুলায়/রিক্ত হবে; স্তব্ধ গীতি ভ্রষ্ট নীড় পড়িবে ধুলায়/অরণ্যের আন্দোলনে।' তিরিশ বছরের বেশী সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গ নামক 'কুলায়'টি যথেচ্ছ ভোগ-দখলের পরে 'বাম গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ' সরকারের বিদায় ঘন্টা বেজে উঠেছে। মৌরুসীপাট্টা চেয়ারে বিষম টান পড়ায় মুখ্যমন্ত্রী বিলক্ষণ হতাশ

সোজা-সাপ্টা

এবং দিশাহারা। তাঁর নিশ্চিত বিদায় কালে রেখে যাচ্ছেন একটি 'উপহার' যা বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের পাঁজরে মোক্ষম parting kick, এবং (রঙ্গনাথ মিশ্র উবাচ) সংখ্যালঘুদের জন্য (পড়ুন মুসলমান) Lebensraum (breathing space), যার নাম সরকারি চাকুরীতে মুসলিম সংরক্ষণ। মুখ্যমন্ত্রী সহৃদয় এবং উদার আশ্বাস দিয়েছেন, এটি ভবিষ্যতে শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রসারিত হতে পারে।

সাধক লালনসাঁই ফকির গভীর খেদের সঙ্গে বলেছিলেন—'বামন চিনি পৈতা প্রমাণ/ বামনি চিনি কিসে রে?'

(এরপর ৪ পাতায়)

পাঠানকোটের কাছে মাধবপুরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে (ডান দিক থেকে) আর এস এসের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত, লালকৃষ্ণ আদবানি ও বিজেপি সভাপতি নীতিন গড়কড়ি।

মহিলা আসন সংরক্ষণ বিল

কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য দেখাল বিজেপি

গূঢ় পুরুষ।। বিজেপি-র নবগঠিত জাতীয় কর্মসমিতি এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটিতে ৩৩ শতাংশ মহিলা কর্মীদের স্থান দেওয়া হয়েছে। সংসদে মহিলা আসন সংরক্ষণ বিলটি বিজেপি-র সমর্থনেই রাজ্যসভায় অনুমোদিত হয়েছে। বিজেপি-র সমর্থন ছাড়া এই বিল সংসদের দুই কক্ষেই পাশ করানো সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে বিলটি এখনও লোকসভায় পেশ করা হয়নি। তার আগেই দলের কর্মসমিতিতে ৩৩ শতাংশ মহিলা কর্মীদের স্থান দিয়ে বিজেপি বার্তা দিয়েছে যে দল মুখে যা বলে, কাজে তা করে দেখায়। এই বার্তাটি দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কারণ, মহিলা আসন সংরক্ষণ বিলটিকে নিয়ে কংগ্রেস এবং বামদলগুলি এমন গরম গরম কথা বলছে শুনে মনে হবে তারাই মহিলাদের স্বার্থরক্ষীকারী দল। সোনিয়া গান্ধী তো একাধিকবার বলেছেন এটি তাঁর স্বপ্নের বিল। অথচ বাস্তব ঘটনা হচ্ছে যে মহিলা আসন সংরক্ষণ বিলটি আদতে বিজেপি-র নেতৃত্বে গঠিত এন ডি এ সরকারের। তখন চেষ্টা সত্ত্বেও এই বিলটিকে সংসদে উপস্থিত করা সম্ভব হয়নি। এই সোনিয়ার কংগ্রেস সাংসদরাই তখন নানারকম আপত্তি তুলে বিলটিকে খতিয়ে দেখতে সংসদের বিশেষজ্ঞ কমিটিতে পাঠাতে বাধ্য করেছিলেন। এরপর প্রথম ইউ পি এ সরকারের আমলে বাম সমর্থনে চলা কংগ্রেস সরকার এই বিলটি নিয়ে কথা বলারই সাহস দেখায়নি। বিশেষত, লালু প্রসাদ যাদব হুমকি দিয়েছিলেন তিনি সরকার ফেলে দেবেন। কেন্দ্রে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি সেদিনও নিঃশর্ত সমর্থন দিয়েছিল। কথায় ও কাজে ফারাক রাখেনি।

দেশের ছোট বড় সব রাজনৈতিক দলই সভা সমিতিতে যে সব গরম গরম বুলি আওড়ায়, কাজের সময় তা সবই ভুলে যায়। পশ্চিমবঙ্গের দলগুলির কথা ভাবুন। সিপিএম দাবি করে তারা গরিব সর্বহারা মানুষের পার্টি। অথচ আলিমুদ্দিনের রাজ্য দফতর থেকে জেলায় জেলায় পার্টির ঝাঁ চকচকে অফিসগুলি দেখলে বিশ্বাস হয় না যে সিপিএম গরিবের পার্টি। পার্টির নেতাদের বাড়ি গাড়ি দেখলে মনে হয় না যে এরা সর্বহারাদের প্রতিনিধি। মহিলা আসন

বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজ

সংরক্ষণ বিলটি বিজেপি-র সমর্থনে পাশ হওয়ার পর সি পি এম নেত্রী বৃন্দা কারাতের নাচানাচি দেখে মনে হতে পারে পার্টি সত্যিই এই সংরক্ষণ নীতিতে বিশ্বাস রাখে। মার্কসবাদীরা সত্যিই চায় রাজনীতিতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি হোক। কিন্তু তা নয়। বৃন্দার নাচানাচিটা বোকা জনগণের জন্য। বাস্তব হচ্ছে মার্কসবাদীরা রাজনীতিতে মহিলাদের প্রাধান্য দিতে চায় না। তাই সি পি এমের কেন্দ্রীয় স্তরে এবং পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যস্তরের সংগঠনে আজ পর্যন্ত মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব তিন শতাংশ ছাড়ায়নি। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য কমিটিতে শ্যামলী গুপ্ত এবং দিল্লীতে বৃন্দা কারাত ছাড়া অন্য কোনও নাম মনে করতে পারছি না। তাও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের স্ত্রী না হলে বৃন্দা কারাত স্থান পেতেন কিনা সন্দেহ আছে। তাই বৃন্দা কারাতের অন্তত নাচানাচি করাটা মানায় না। তাঁর কর্তব্য, আগে দলের মধ্যে ৩৩ শতাংশ মহিলা কর্মীদের স্থান সুনিশ্চিত করে পরে ক্যামেরার সামনে নাচা। তার আগে নয়।

পশ্চিমবঙ্গে প্রধান বিরোধী দল হিসাবে দাবি করা তৃণমূল কংগ্রেসকে দেখুন। নেত্রী মমতা ছাড়া আর ক'জনের নাম বলতে পারেন! অনেক মাথা ঘামিয়েও সাংসদ কাকলী ঘোষদস্তিদার এবং শতাব্দী রায় ও বিধায়ক সোনালী গুহ ছাড়া আর অন্য নাম মনে করতে পারবেন না। তবে মমতা একাই ১০০ শতাংশ বলা যেতে পারে। কারণ, তাঁর দলে তিনিই সর্বেসর্বা। মমতাই তৃণমূলের সংবিধান। প্রথম কথা থেকে শেষ কথা তিনিই বলেন। বৃন্দাবনে তিনিই রাধা, তিনিই কৃষ্ণ। তিনি ছাড়া তৃণমূলে অন্য গতি নেই। সুতরাং দলের সংগঠনে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব কত শতাংশ এমন প্রশ্ন তোলার মানে হয় না। যেন, মুসলিম ভোট পেতে মরিয়া মমতা তাঁর দলের সংগঠনে কতজন মুসলিম সদস্যাকে স্থান দিয়েছেন কেউ কী জানেন! মমতাও মুখে বলেন, তিনি এবং তাঁর দল মহিলা আসন সংরক্ষণ বিলের সমর্থক। যদিও তাঁর দলের দুই সাংসদ রাজ্যসভায় ভোটাভুটির সময় নেত্রীর নির্দেশে অনুপস্থিত ছিলেন। মমতার ভয়, বিলটিকে প্রকাশ্যে সমর্থন করলে গোঁড়া রক্ষণশীল মোল্লা-মৌলবিরা চটে যেতে পারে। অর্থাৎ কথায় ও কাজে সি পি এম, তৃণমূল এবং কংগ্রেস দলে বিস্তর ফারাক। সেখানে অবশ্যই বিজেপি একটি ব্যতিক্রমী দল।

ভারতে সন্ত্রাসের চক্রান্ত

'ফিমেল হ্যাডলি' ধৃত আমেরিকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সন্ত্রাসবাদকে ঠেকাতে আমেরিকা পাকিস্তানকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে আসছে। অথচ সেই আমেরিকার বুকে বসেই দক্ষিণ এশিয়াব্যাপী ইসলামিক জেহাদের পরিকল্পনা ও তা কার্যকর করার ষড়যন্ত্র করে চলেছে জেহাদি জানে ওরফে কোলেন আর লা রোজে। তার আরও অন্য এক নাম হলো ফতিমা লা রোজে। গ্রেপ্তারের খবরটা বাজারে অনেক পরে এলেও ফতিমাকে আমেরিকার অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অফ্ ইনভেস্টিগেশন (এফ বি আই) গত বছরের অক্টোবরেই গ্রেপ্তার করেছিল। আদালতে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা

হয়েছিল যে, গত একবছর ধরে সে আমেরিকায় বসে বিশ্বব্যাপী ইসলামি জেহাদের চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত শুধু নয় বিস্তারেও সক্রিয় ছিল। ৪৬ বছর বয়স্কা কোলেন লা রোজে একশভাগ শ্বেতকায়া আমেরিকান মুসলমান মহিলা। সে সেজন্য অনেকের কাছে ফিমেল হ্যাডলি বলেও পরিচিত ছিল। জেহাদি জানের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগগুলি হ'ল—

★ জেহাদি সন্ত্রাসবাদীদের ষড়যন্ত্রে সহযোগিতা করা।

★ সুইডেনে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকা।

★ পরিচয়পত্র চুরি করা, মিথ্যা ভুয়ো বিবৃতি দেওয়া।

★ সুইডেনের ওই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত আয়ার্ল্যাণ্ডে সাতজনকে ধরা হয়েছে।

জেহাদি জানের গ্রেপ্তারের ঘটনায় দেখা যাচ্ছে যে, আমেরিকার বুকে বসেই ইসলামি-সন্ত্রাসবাদীরা সাদা চামড়ার আমেরিকানদেরই তাদের দলে ঢোকাতে তৎপর এবং সফল। আমেরিকান এ্যাটর্নি মিখাইল লেভি তার ১১ পৃষ্ঠাব্যাপী বক্তব্যে জানিয়েছেন—'এই ঘটনায় প্রমাণিত হচ্ছে জেহাদিরা আমেরিকানদেরকে তাদের সঙ্গে আদর্শগতভাবে সামিল করতে তৎপর। এবং কোনও এক ব্যক্তিত্ব কীভাবে এক জেহাদি

(এরপর ৪ পাতায়)

'সাইবার ক্রাইম'

বিপদের আর এক নাম

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সন্ত্রাসবাদের মতোই আরও একটি ভয়াবহ বিপদ ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে তুলছে। আর তা হলো 'সাইবার অপরাধ'। বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক ব্যবহৃত এবং প্রচলিত অত্যাধুনিক তথ্য-প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সংগঠিতভাবে তা করা হচ্ছে। এরফলে কোনও একটি সংস্থা বা কোম্পানী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাই নয়, বিপন্ন হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও। গত তিনবছরে এধরনের সাইবার অপরাধের বাড়-বাড়ন্ত হয়েছে দুশো শতাংশেরও বেশি।

সম্প্রতি গুয়াহাটিতে এক অনুষ্ঠানে গুরুতর এই সমস্যার কথা জানিয়েছেন আমেদাবাদবাসী হ্যাকার এবং সাইবার অপরাধ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সানি বাগেলা। শ্রীবাগেলা নিজে 'টেক ডিফেন্স প্রাইভেট লিমিটেড' নামে এক সাইবার অপরাধ তদন্ত সংস্থার ডিরেক্টর। তিনি ইতিমধ্যে আমেদাবাদ পুলিশের অপরাধ দমন শাখার সঙ্গে মিলে ষোলটিরও বেশি সাইবার অপরাধের মামলা নিষ্পত্তি করেছেন। তার মধ্যে আমেদাবাদে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ এবং ২৬/১১-র সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের পরবর্তীতে পাক-ভিত্তিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন 'জামাত উদ দাওয়া'-র বিষয়ে প্রচুর তথ্য ইন্টারনেট হ্যাকিং এবং তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে মুম্বাই পুলিশকে সহযোগিতা করেছেন।

আমেদাবাদে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের সময়ে ধমকি দেওয়া উড়ো মেল পাঠাতে সাহায্য ক'রত 'ইয়াহু' কোম্পানীর এক ইঞ্জিনীয়ার। শ্রীবাগেলা জানিয়েছেন, বর্তমানে অনেক নামী-দামী ব্যক্তি বিদেশী সংস্থার সাহায্য নিয়ে ভারতের গোয়েন্দা ব্যবস্থা এবং ইন্ডিয়ান নেটওয়ার্ক বিষয়ে তথ্য চুরি করছে। যা কার্যত 'সাইবার অপরাধের' তালিকায় পড়ে। এসময়ে সাইবার অপরাধ শুধুমাত্র ডাটা চুরি, সোস্যাল নেটওয়ার্ক এবং ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে আর্থিক চৌর্যবৃত্তি বা এস এম এস-এর অপব্যবহারে সীমাবদ্ধ নেই। শ্রীবাগেলার মতে, ভারতীয় গোয়েন্দারা এই নবপর্যায়ের সাইবার অপরাধ দমন ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষ নয়। প্রযুক্তিগত দিক থেকেও অনেক পেছিয়ে রয়েছি। এমনকী দুই শতাংশ অফিসাররাও 'ভয়েস ওভার ইন্টারনেট

(এরপর ৪ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

বাংলাদেশে মাল পাচার হওয়াতেই অসমে অনাহার, স্বীকারোক্তি মুখ্যমন্ত্রীর

সংবাদদাতা।। ভারত-বাংলাদেশ লাগোয়া সীমান্ত এলাকায় অসমবাসীরাও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি -জনিত কারণে খাদ্যসঙ্কটে ভুগছে। আর এসময়েই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ দাবী করছেন, ভারত থেকে সীমান্ত এলাকা দিয়ে খাদ্যদ্রব্য বাংলাদেশে পাচার হওয়ার কারণেই দামবৃদ্ধি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সংকট দেখা দিয়েছে। এধরনের মেঠো যুক্তি নস্যাৎ করে দিয়ে অসম বিধানসভার তাবৎ বিরোধী দল এককাট্টা হয়ে সরকারের কাছে কৈফিয়ৎ দাবী করেছে। রাজ্যের অন্যতম বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টি এবং অন্য কয়েকটি দলও আলাদাভাবে স্থানে স্থানে রাজ্যজুড়ে ধর্না ও বিক্ষোভ কর্মসূচী নিয়েছে।

তবে গগৈ-এর কথার মধ্যে কিছুটা হলেও সত্যতা রয়েছে। তিনি বলেছেন, 'আমাদের রাজ্যের সরবরাহ দপ্তর থেকে চাল, ডাল, গম, চিনি ও কেরোসিন পর্যাপ্ত পরিমাণে পাঠানো হচ্ছে। তবে তা একটি শক্তিশালী লবি ভারত-বাংলাদেশ লাগোয়া ধুবড়ি জেলার মানকাচার এবং দক্ষিণ শালমারা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাচার করে যাচ্ছে। এবং অসমের দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ খাদ্যাভাবে অনাহারে ভুগছেন।" এই শক্তিশালী লবিতে কারা রয়েছেন তা মুখ্যমন্ত্রী খোলসা করে বলেননি। তবে তাদের সিংহভাগই যে মুসলিম তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এছাড়া উল্লেখযোগ্য, পশ্চিমবঙ্গের মতো বামশাসিত রাজ্যেও

"একটি শক্তিশালী লবি ভারত-বাংলাদেশ লাগোয়া ধুবড়ি জেলার মানকাচার এবং দক্ষিণ শালমারা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে মাল পাচার করে যাচ্ছে। এবং অসমের দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ খাদ্যাভাবে অনাহারে ভুগছেন।"

রেশনে প্রাপ্য চাল-গম-চিনি না পাওয়ায় একসময়ে প্রবল জনরোষ আছড়ে পড়েছিল। সেক্ষেত্রেও ব্যাপক দুর্নীতি ও চোরাচালানের খবর উঠে এসেছিল। আর গরীবদরদী বামফ্রন্ট সরকার হাজার চেষ্টা করেও আমলাসোলে অনাহারে মৃত্যুর খবর ধামাচাপা দিতে পারেনি। উল্টে সেই চেষ্টা করতে গিয়ে আরও অনেক আমলাসোলের খবর শিরোনামে উঠে আসে।

গগৈ জানিয়েছেন, ব্যাপকহারে বাংলাদেশে নিরন্তর চোরাচালানের কারণেই দারিদ্র্যসীমার নীচে জীবনযাপনকারী পরিবারগুলো অনাহারে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, রাজ্যের খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীই যদি বিশিষ্ট শ্রেণীর স্মাগলারদের কাছে অসহায় বোধ করেন তাহলে সাধারণ মানুষের অবস্থাটা কোথায় দাঁড়াবে? দক্ষিণ শালমারা এবং মানকাচার এলাকায় ১৩টি কো-অপারেটিভ এবং ৬০ জন ডিলারকে প্রতিমাসে চারশ' লিটারের বেশি কেরোসিন অসমের সরবরাহ দপ্তর থেকে পাঠানো হলেও তা কখনও প্রকৃত প্রাপকদের হাতে পৌঁছায় না। চলে যায় স্মাগলার মারফৎ বাংলাদেশে। অনেক আপত্তি, প্রতিবাদ জানানোর পরও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এ পি এল, বি পি এল, মিড ডে মিলের কোটাও যথার্থ প্রাপকরা পায় না।

দক্ষিণ শালমারা অসম-বাংলাদেশ সীমান্তের একটি স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টে অবস্থিত। এই এলাকায় জনবিরোধী তথা ভারতবিরোধী কার্যকলাপ শুধুমাত্র যে স্মাগলিং-এ সীমাবদ্ধ নেই তাও সবার জানা। তবুও সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে কোনও বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতির কারণে ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।

এই সময়

জেহাদী মদতদাতা

ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সুস্পষ্ট জেহাদী মদতের প্রমাণ মিলল হাতে-নাতে। সম্প্রতি জেহাদী সংগঠন হিজবুল মুজাহিদিনের চীফ কম্যান্ডার সঈদ সালাউদ্দিন পাকিস্তানের ডন নিউজ চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন— "মুজাহিদিনদের কাশ্মীরে কর্মসক্রিয়তা বাড়ছে এবং একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যেই তা পরিচালিত হচ্ছে।" এই 'কর্মসক্রিয়তা'র অর্থ কাশ্মীরে ভারত-বিরোধী যাবতীয় কার্যকলাপ চূড়ান্তভাবে বৃদ্ধি করা এবং 'নির্দিষ্ট লক্ষ্য' মানে হয়তো সেখানে কোনও বিশেষ স্থানে নাশকতামূলক কাণ্ড ঘটানো— এমনটাই আশঙ্কা নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের। পাক-মাটিতে ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদী হামলার ডাক এবার প্রকাশ্যে— অথচ মুখে কুলুপ পাক-প্রশাসনের।

মাও-পাল্টি

পোশাক-আশাক থেকে খাদ্যদ্রব্য— মাওবাদীদের সবকিছুই রহস্যাবৃত। তাদের খাদ্যদ্রব্যের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এখনও জনসমক্ষে হাজির না হলেও 'পাল্টি-খাওয়া' যে তার মধ্যে অন্যতম, সেটি প্রমাণিত হলো সম্প্রতি। গত ২১ মার্চ সিপিআই (মাওইস্ট)-এর উত্তর রিজিওনাল ব্যুরোর মুখপাত্র অজয় দাবী করেন নকশাল নেতা আজাদ নিরাপদেই আছেন। ইতিপূর্বেই তাঁরাই বলেছিলেন যে অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের পর থেকেই নাকি আজাদকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সম্প্রতি বাজারে একটা গুজব ছড়িয়েছে যে আজাদ নাকি পুলিশী হেপাজতেই রয়েছেন। সুতরাং এই পাল্টি-টা মাওবাদী কর্মীদের মনোবল বাড়াতে, নাকি পুলিশকে ভড়কে দিতে, তা নিয়েই ধন্দে বিশেষজ্ঞরা।

মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে যুঝতে

মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে আর কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছে না কেন্দ্রীয় সরকার ওরফে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। মাসখানেক আগেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে আসন্ন আর্থিক মরসুমের (২০১০-১১) জন্য নজরদারি নীতি (মনিটারি পলিসি) ঘোষিত হয়েছিল। এরপর মাসখানেক যেতে না যেতেই রেপো রেটের হার বাড়িয়ে ৫ শতাংশ ও রিভার্স রেপো রেটের হার বাড়িয়ে ৩.৫ শতাংশ করে তারা। সেই সাথে স্বল্প সময়-ভিত্তিক ঋণগ্রহীতাদের সুদের হারও ২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করা হয়েছে। এত করেও কি মুদ্রাস্ফীতিকে আটকানো যাবে? কারণ গলদটা যত না আর্থিক-নীতিতে, তার থেকে বেশি সদিচ্ছায়!

হাইজ্যাকিং রুখতে

কন্দহর কাণ্ডের দায় যে বিজেপি পরিচালিত সরকারের ছিল না, বরং এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট আইনের ত্রুটি-বিচ্যুতিই যে মূলতঃ দায়ী এটা একপ্রকার মেনেই নিল কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকার। সেই আইনের ত্রুটি-বিচ্যুতি রুখতে ১৯৮২ সালের অপহরণ আইন পরিবর্তন করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক তাদের পাঠানো নোটে অপহরণকারীর এক এবং একমাত্র শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের সুপারিশ করেছে। কিন্তু যে দেশে সুরক্ষা কিংবা নিরাপত্তা অর্থাৎ জাতীয় আগ্রহের বিষয়গুলোকে নিয়েও 'রাজনীতি' হয় সেখানে এধরনের বিল-কে আইনে পরিণত করাটা খুবই কষ্টকর।

জ্বালানীর মূল্যবৃদ্ধি

'নিঃশব্দ বিপ্লব' নামক ইতিহাসের বিষয়ের সঙ্গে 'জ্বালানীর মূল্যবৃদ্ধি' সংক্রান্ত অর্থনীতিজনিত বিষয়ের মিল রয়েছে এমন তত্ত্ব আজ অবধি কোনও ইতিহাসবিদ কিংবা কোনও অর্থনীতিবিদ দিয়েছেন— এই অপবাদ কেউই দিতে পারবেন না। তবে এই কাণ্ডটিই ঘটতে চলেছে মনমোহন-প্রণব-চিদাম্বরমের ভারতবর্ষে। কিছুদিন আগেই বাজেটে জ্বালানী তেলের একদফা মূল্যবৃদ্ধির অব্যবহিত পরেই প্রায় নিঃসাড়ে আগামী পয়লা এপ্রিল থেকে মোটরগাড়ির জ্বালানী তেলের ক্ষেত্রে প্রতি লিটারে প্রায় চল্লিশ পয়সা মূল্যবৃদ্ধি হতে চলেছে। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের সচিব এস সুদর্শন গত ২১ মার্চ একথা জানিয়ে বলেন, ভারতের ১৩টি শহরে (ইউরো-৪) পেট্রল ও ডিজেলের দাম বাড়বে।

দ্যাখ কেমন লাগে

কিছুতেই আর পেরে ওঠা যাচ্ছিল না নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে। কোথায় গুজরাট - দাঙ্গার অপবাদ নিয়ে ঘরে মুখ লুকোবে, তা নয় শিল্প থেকে শিক্ষায় সবেতেই অগ্রণী গুজরাট, বিশেষজ্ঞরা যে কৃতিত্বভার অর্পণ করেছেন নরেন্দ্র মোদীর স্কন্ধেই। কোনও মানে হয়! সুতরাং তাঁকে অপদস্থ করার মোক্ষম মওকা হলো গুজরাট দাঙ্গার ভূতকে তাঁর পেছনে লেলিয়ে দেওয়া। সেই কারণে রটিয়ে দেওয়া হলো দাঙ্গাকাণ্ডের তদন্তকারী স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (এস আই টি)-র মুখোমুখি হতে চাইছেন না নরেন্দ্র মোদী। যার সটান জবাব দিয়ে তিনি জানালেন, এস আই টি কোনও সমন-ই পাঠায়নি তাঁকে। সুতরাং মুখোমুখি হবার প্রশ্ন আসে কোত্থেকে? এবারে ঢোঁক গিলল সেই তদন্তকারী টিম। প্রশ্ন উঠছে, সমন পাঠাতেই যারা থরহরি কম্পমান, সত্যের মুখোমুখি হলে তাদের কি হবে?

গাত্রদাহ

অখিল ভারত মুসলিম সংরক্ষণ প্রতিযোগিতায় বুদ্ধ বাবুর পশ্চিমবঙ্গ সোনিয়া গান্ধীর বকলমে কে. রোসাইয়ার অন্ধ্রপ্রদেশকে পেছনে ফেলে দেবেন, তাও কি কখনও হতে পারে? আসলে এরাজ্যের মতো অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারও চেয়েছিল মুসলমানদের জন্য চাকরিতে চার শতাংশ কোটা বরাদ্দ করতে। কিন্তু বাদ সেধেছিল অন্ধ্র হাইকোর্ট। অথচ পশ্চিমবঙ্গের এহেন অগ্রগতিতে (মুসলিম সংরক্ষণে) চূড়ান্ত গাত্রদাহ হওয়ায় সে রাজ্যের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা হবে!

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রাজ্য বাজেট না সিপিএমের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার অর্থাৎ বামফ্রন্ট সরকারের বাজেট গত ২২ মার্চ, ২০১০-এ পেশ হইয়াছে। কোনও নির্বাচনের আগে যে কোনও দলীয় সরকারের (বিজেপি সরকার বাদে) বাজেট যেমন হইয়া থাকে, ঠিক তেমন বাজেটই এইবার রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার পেশ করিয়াছে। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত এই বাজেট রাজ্য বিধানসভায় এদিন পেশ করিয়াছেন। ইনি রাজ্যে একজন (ভারতের মধ্যে বোধহয় প্রথম) ঘাটতিহীন বাজেটের প্রবক্তা। অনেকবারই ঝানু অর্থনীতিবিদদের পর্যন্ত এই ঘাটতিহীন বাজেট পেশ করিয়া চমকাইয়া দিয়াছেন।

এইবারের বাজেট কিন্তু তিনি ঘাটতিহীন হিসাবে পেশ করিতে পারেন নাই। তবে চেষ্টার যে কোনও কসুর তিনি করেন নাই তাহা নহে। বাজেটটি ভাল করিয়া পড়িলেই তাহা বোঝা যায়। যেমন ধরুন বাজেটে মাত্র ৪ কোটি টাকা ঘাটতি দেখানো হইয়াছে। অথচ আর্থিক বৃদ্ধির হার এইবার কম হইয়াছে। অপর দিকে আবার শিল্পে বৃদ্ধি দেখানো হইয়াছে ৩.৮ শতাংশ; আর কৃষিতে বৃদ্ধি দেখানো হইয়াছে ২.৪ শতাংশ।

এখন প্রশ্ন হইল ঘাটতি কেন হয়? সোজা কথায় বলা যায়—আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হইলেই ঘাটতি হয়। কিন্তু আয় তো বাড়াইয়াও দেখানো যায়। কেমন করিয়া বাড়াইয়া দেখানো যায়? কেমন করিয়া আবার? ধার করিয়া। ধার করিয়াই তো আয় বাড়ানো যায়। যেমন সাধারণ মানুষ ক্রেডিট কার্ড মারফৎ আয় বাড়াইয়া থাকেন। শোধ করিবার প্রশ্ন পরে। না শোধ করিতে পারিলে রেল লাইনতো আছেই। আত্মহত্যা তো করাই যায়। কিন্তু ঋণদাতাদের কী হইবে? কেন? লেম্যান ব্রাদার্স, মেরিল লিঞ্চ আর্থিক বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলোর যেমন অবস্থা হইয়াছে তেমন হইবে।

রাজ্য সরকার ঠিক তাহাই করিয়াছে। ঋণকেই আয় হিসাবে দেখাইয়াছে। বাজেটে ৩৭ কোটি টাকা ঋণ হিসাবে পাওয়া অর্থ আয়ের ঘরে দেখানো হইয়াছে। অতএব প্রকৃত ঘাটতি কিন্তু এই ৩৭ কোটি আর ঘোষিত ৪ কোটি অর্থাৎ মোট ৪১ কোটি টাকা। কিন্তু ১১০ কোটি টাকা তো নতুন কর চাপানো হইয়াছে। তাহা হইলে ঘাটতির তো কোনও প্রশ্নই আসে না। এই কর সংগ্রহ করিয়া ঘাটতি মিটাইয়াও আরও অনেক টাকা উদ্বৃত্ত দেখানো যাইতো! তবে কেন তাহা করিলেন না রাজ্যের কেইন্‌স্‌বাদী অর্থমন্ত্রী? মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাহার কমিউনিস্ট প্রশাসনকে ভাল করিয়াই জানেন। তিনি তাহার অভিজ্ঞতা হইতে জানেন যে এই করের বেশীর ভাগ টাকাই রাজ্য কোষাগারে জমা পড়িবে না। রফা হইয়া দলের কোষাগারেই যাইবে। এই রেকর্ড রাজ্য বামফ্রন্ট সরকারের বহু দিনের।

এতই যদি ঘাটতি তাহা হইলে দরাজ হাতে ৭০০ কোটি টাকা ভর্তুকি বিলাইলেন কেন অর্থমন্ত্রী? চা শিল্পে তিনি সেস তুলিয়া দিলেন; বাংলা, হিন্দী ও নেপালী সিনেমার টিকিটের দাম কমাইলেন। চাল ও গমের উপর কর উঠাইলেন, বন্ধ কল-কারখানার শ্রমিকদের ভাতা বৃদ্ধি করিলেন; বিধবা ও বার্ধক্যদের ভাতাও বাড়াইয়া দিলেন।

এসব প্রতিশ্রুতিই কেবলমাত্র নির্বাচনের দিকেই তাকাইয়াই করা হইয়াছে এমন কথা জনগণের মধ্যে কান পাতিলেই শুনা যাইবে। নির্বাচন বড় বালাই।

বাজেট পেশের পরেই কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের সতী-সাবিত্রী-সত্যবানেরা কক্ষ ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু সংখ্যালঘু তোষণ তো বামেরাও এই বাজেটে কম করে নাই। তাহা হইলে আবার কংগ্রেসীদের গোঁসা কিসের? রাজ্য অর্থমন্ত্রী মাদ্রাসা দফতরের বরাদ্দ এক লাফে ১২১ কোটি হইতে বাড়াইয়া ৩০০ কোটি টাকা করিয়া দিয়াছেন। সংখ্যালঘু ছাত্রীদের স্কলারশিপের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। সংখ্যালঘুদের (স্পষ্ট করিয়া বলিলে মুসলমানদের) আয়ের বৃদ্ধি করিবার লক্ষ্য ধার্য্য করিয়া, মুসলমান তোষণ কি বামপন্থীরা একটু বেশি করিয়া ফেলিয়াছে, তাই চিন্তিত কংগ্রেসীরা? কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার তো বাজেটে দেশের ৯০টি মুসলিম অধ্যুষিত জেলায় বিশেষ উন্নয়নের কথা ঘোষণা করিয়া দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার কেন সারা রাজ্যটিকেই মুসলিম অধ্যুষিত বলিয়া ঘোষণা করিল না—ইহাই কী কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের গোঁসার কারণ?

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

আজকাল এমন একটা কথা বলা হয়ে থাকে যে, রাম ও রাবণের মধ্যে যুদ্ধ টা হলো আর্য ও দ্রাবিড়ের মধ্যে যুদ্ধ। কি হাস্যকর কথা! রাবণ নিজে ছিলেন বড় সংস্কৃত পণ্ডিত ও শিবের ভক্ত। এমন কি তিনি সামবেদকে সঙ্গীত রূপ দিয়েছিলেন। তাঁর বাবা বিশ্বশ্রবা এবং ঠাকুর্দা পুলস্ত্য ছিলেন ব্রাহ্মণ। বলতে গেলে রাবণ দাক্ষিণাত্যে অত্যাচার নির্যাতন চালাচ্ছিলেন, রাম তার থেকে দক্ষিণের জনগণকে মুক্ত করেন।

— শ্রী গুরুজী

এরই নাম আইনের শাসন?

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

কিছুদিন আগে কোনও কোনও বড় আমলা হুঙ্কার ছেড়েছিল—জঙ্গলমহলের ছত্রধর মাহাতোর সঙ্গে যে-সব বুদ্ধিজীবী দেখা করেছিলেন, তাঁদেরও ধরা হবে, কারণ কেউই আইনের ঊর্ধে নন—সুতরাং আইন তার নিজের পথেই চলবে।

এতে অবশ্যই দুটো কথা মনে এল।

প্রথমত, ছত্রধর মাহাতোর সংগঠনটাকে আইনত নিষিদ্ধ করা হয়নি। সেই জন্যেই তাঁর সঙ্গে যাঁরা দেখা করেছেন বা কথা বলেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া যায় না। তাছাড়া শ্রী মাহাতোর সঙ্গে সরকারের কিছু কর্তাব্যক্তিও মহাকরণে কথা বলেছিল একটা সমঝোতার জন্য—তাঁদের বিরুদ্ধেও কি আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে?

এই অসঙ্গতির কারণেই মহাশ্বেতা দেবী ও মমতা ব্যানার্জীর এক ধমকেই পূর্বোক্ত আমলা-অফিসাররা মুখ বন্ধ করে ফেলেছে, ঢোঁক গিলে সংশ্লিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের শ্রদ্ধা জানিয়েছে। সরকারের ক্রীতদাস সাজতে গিয়ে এই সব বেতনভুক, মেরুদণ্ডহীন অফিসররা নিজেদের খেলো করে ফেলেছে কতটা, সেটা বোঝার ক্ষমতাও তারা হারিয়ে ফেলেছে।

দ্বিতীয় বিষয়টা আরও গুরুত্বপূর্ণ।

পূর্বোক্ত হুমকির মাধ্যমে তারা বোঝাতে চেয়েছে যে, এই রাজ্যে আইনের শাসন রয়েছে—সুতরাং আইন তার পথেই চলবে—আইনভঙ্গকারী যে বা যারাই হোন না কেন, তাঁরা কেউই আইনের ঊর্ধে নন।

কিন্তু আমরা কি করে বিশ্বাস করব যে এই রাজ্যে আইনের শাসন আছে, বা আইন তার পথে চলে? কিম্বা আইনের ঊর্ধে সত্যিই কেউ নন?

সরকারি কর্তারা পদোন্নতি, পোস্টিং ও অন্যান্য স্বার্থের সন্ধানে উন্মাদের মতো যতই বাণী বিতরণ করুন না কেন, আমরা তো অন্ধ-বধির হয়ে যাইনি—সরকারি অনুগ্রহ নিয়েও আমরা লালায়িত-পুলকিত নই। সুতরাং নৈরাজ্য ও স্বৈরাচারিতার অজস্র চিত্র আমাদের সামনে ধরা পড়েছে—ক্রমে আমাদের মনে এই ধারণাই গড়ে উঠেছে যে, এখানে দল ও নেতার শাসন আছে, আইনের শাসন নেই।

অল্প কিছু উদাহরণ দিই।

বিজন সেতুর ঘটনাটা প্রথমে মনে করিয়ে দিই। আনন্দমার্গীদের বিরুদ্ধে শাসকদের কিছু অভিযোগ ছিল। কিন্তু তার জন্য পুলিশী তদন্তের ব্যবস্থা করাই ছিল গণতান্ত্রিক ব্যাপার। কিন্তু বিজন সেতুর ওপর সতেরো জন আনন্দমার্গীকে (তার মধ্যে সন্ন্যাসিনীও ছিলেন) পিটিয়ে-পুড়িয়ে-খুঁচিয়ে-থেঁতলে যেভাবে হত্যা করা হয়েছিল, তার নজির কোথাও মিলবে না। এই ব্যাপারে কারও বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা কি নেওয়া হয়েছে? সন্ন্যাসী হত্যা কি নরহত্যার পর্যায়ে পড়ে না? আইন এক্ষেত্রে কোথায় নিজেকে লুকিয়েছে?

মরিচঝাঁপির কথা মনে আছে? এক সময় 'বামপন্থী' নামধারী কিছু 'মহান' নেতা উদ্বাস্তুদের আন্দামান বা দণ্ডকারণ্যে পাঠানোর বিরুদ্ধে ছিল। তাদের বক্তব্য ছিল—এই বাংলাতেই তাঁদের পুনর্বাসন দেওয়া যায়। এই মর্মে তারা উদ্বাস্তুদের কাছে ভাষণও দিয়েছিল। ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর সেই উদ্বাস্তুরা মরিচঝাঁপিতে বসতি স্থাপন করেছিলেন। সরকারি সাহায্যের প্রত্যাশা না করে তাঁরা নিজেরাই গড়ে তুলেছিলেন এক নতুন বসতি—কৃষি, শিক্ষা, কুটিরশিল্প, মাছ চাষ প্রভৃতি দ্বারা সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন অঞ্চলটাকে।

কিন্তু হঠাৎ—১৯৭৯ সালে, ১৪৪ ধারা ঘোষণার মাধ্যমে সমস্ত অঞ্চল কে অবরুদ্ধ করা হয়, বন্ধ করে দেওয়া হয় পানীয় জল আনার যোগাযোগ, বিষাক্ত করে দেওয়া হয় টিউবওয়েল ও পুকুর-নদীর জল। পুলিশের গুলিতে মারা যান ৩৬ জন, অনাহারে মৃত্যু ঘটে ১৬৬ জনের, অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে ও বিনা চিকিৎসায় মারা যান ২৩৯ জন। মহিলাদের ওপর ধর্ষণের ফলে মৃত্যু ঘটে ২৩ জনের। নিখোঁজের সংখ্যা ১২৮। নৌকো ছিনতাই হয় ১৬৩ টা। রঞ্জিত কুমার শিকদারের 'মরিচঝাঁপির ওরা কারা', জগদীশচন্দ্র মণ্ডলের 'মরিচঝাঁপির নৈঃশব্দের অন্তরালে' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং নিরঞ্জন হালদারের বিবরণ পড়ে বার বার আমরা শিউরে উঠেছি— মনে মনে প্রশ্ন করেছি—

'মহান' পশ্চিমবঙ্গে শাসকদলের নেতা ও হার্মাদরা আইনের ঊর্ধে। এখানে আছেন দুই ধরণের মানুষ—'আমরা' ও 'ওরা।' সুকুমার রায়ের কবিতাটা মনে পড়ছে—

'আমরা ভাল, লক্ষ্মী সবাই—
ওরা ভারী বিশ্রী,
ওরা খাবে নিমের পাচন—
আমরা খাব মিছরি।'

এটা একটা সভ্য দেশ? এই শাসকরা মার্ক্সবাদী জননেতা? ভাবা যায়—লঞ্চে করে নিয়ে অসংখ্য মানুষকে সমুদ্রের কাছে বাঘ-কুমীরের মুখে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল? তারা চিৎকার করে কেঁদেছেন তাঁদের পাড়ে কোথাও ছেড়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু 'মহান' নেতা জ্যোতি বসুর পুলিশ ক্যাডাররা সেই অশ্রুতে গলে যায়নি।

এখানে আইনের শাসন না কি আছে? এই অপারেশনের কাণ্ডারী ও. সি.-কে নাকি প্রকাশ্য দিবালোকে পরে গুলি করা হয়েছে। তারও বিচার হয়েছে কি? এক্ষেত্রেও আইন নেই!

বানতলার ঘটনাটা মনে করুন। 'ছেলেধরা' অভিযোগ তুলে এক সন্ধ্যায় কয়েকজন সমাজকর্মীকে হত্যা করা হলো, প্রাণ দিলেন অ্যাম্বুলেন্স্-ড্রাইভারও। এক মহিলাকে হত্যা করে পাট-ভাঙা শাড়ি ব্লাউজ পরানো হয়েছিল। অনেকেই জানেন না পোস্টমর্টেমের সময় তাঁর ক্ষতবিক্ষত যৌনাঙ্গ দেখে লেডী ডাক্তার মূর্ছা গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সব নরপশুরা শাসকদলের ছত্রতলে থাকায় 'মহান' বামফ্রন্টের 'মহান' আইন এক্ষেত্রেও নীরব হয়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গের 'নীরো' দার্শনিকের মতো তখন নির্লিপ্তকণ্ঠে বলেছিল—'এই রকম কতই তো হয়!'

এর পরেও ঘটেছে কেশপুর, সূচপুর, নানুর, গড়বেতা প্রভৃতি স্থানের বীভৎস ঘটনা। কেশপুরে দিনের পর দিন ক্যাডারদের বাইক-বাহিনী এলাকা দখল করেছে। বিরোধী-দলের হাজার-হাজার সমর্থক প্রাণের ভয়ে আশ্রয় নিয়েছেন ত্রাণ-শিবিরে। আমলা-পুলিশরা নপুংসকের মতো, দেখে গেছে এই অভিনব বিপ্লব-কাণ্ড। অনেক ক্ষেত্রে লাশ সরিয়ে ফেলা হয়েছে পুলিশের জ্ঞাতসারেই। এই সব নিয়ে মামলাও হয়েছে—কিন্তু সাক্ষীদের তো জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়, তাই অনেকে আদালতে বয়ান পাল্টে ফেলেছেন। লেনিনের মতে, কমিউনিস্ট দল হলো ভ্যানগার্ড অব্ দ্য প্রলেটারিয়েট' বা সর্বহারা শ্রেণীর অগ্রদূত—এবার বুঝলাম সর্বহারারাই কমিউনিস্ট দলের মূল শত্রু।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম সেই ইতিহাসই সূচনা করেছে। জোর করে কৃষি জমি কেড়ে নিয়ে পেয়ারের শিল্পপতিদের উপঢৌকন দেওয়ার জন্য সিঙ্গুরে পুলিশ ক্যাডারের যৌথবাহিনী তাণ্ডব চালিয়েছে—তাতে হতাহত হয়েছে বালক-শিশুও। তাপসী মালিককে ধর্ষণ করার পর নরাধমরা হত্যাও করেছে—ন্যাতার সুরে বশংবদ পুলিশ কিন্তু গেয়ে উঠেছে সেটা ব্যর্থ প্রেমজনিত আত্মহত্যা। সি.বি.আই. তদন্তে পরিষ্কার হয়ে গেছে নির্মম সত্যটা।

অস্ত্রসহ দশজন ক্যাডারকে জননী ইটভাটায় সি.আর.পি.এফ. ধরে ফেলেছে—কিন্তু তাদের ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে ঘৃণিত রাজ্য পুলিশ। ওই কেন্দ্রীয় বাহিনীর অফিসাররা জানিয়েছেন—তাঁদের অভিযানের আগাম খবর রাজ্য-পুলিশই অপরাধীদের জানিয়ে দেয়, তার ফলে সহজে তাদের ধরা যায় না। আইনের শাসনে নাকি এমনটাই হয়। মার্ক্স কখনও এমনটা ভেবেছিলেন?

নেতা-কর্তাদের পকেট-শিল্পের তাগিদে নন্দীগ্রামে পুলিশ-ক্যাডারের যৌথ অভিযানে প্রাণ দিয়েছেন অন্তত ১৪ জন কৃষক (চটি-পরা ক্যাডারও ছিল পুলিশের বেশে), ১৫০ জন আহত হয়েছেন, ধর্ষিতা হয়েছেন আফরোজা বিবি প্রমুখ বহু অসহায় নারী। বুলেট ছোঁড়া হয়েছেনাকি মাত্র গোটা তিরিশেক—কিন্তু সেই রহস্যময় বুলেটগুলো মাঝপথে আরও বুলেট প্রসব করায় এত মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্ট এই কুকীর্তিকে নিন্দা করেছে, বলেছে এই মারণযজ্ঞ ছিল 'wholly unconstitutional।'

অথচ তার পরেও—কালীপুজোর সময় পুলিশ-পিকেট সরিয়ে দিয়ে আবার নরমেধ-যজ্ঞ সাঙ্গ করা হয়েছে—সেটা নাকি ছিল 'সূর্যোদয়'। ক্ষুব্ধ রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী কিন্তু বলেছিলেন— এক্ষেত্রে অমানবিকতার অন্ধকারে দেওয়ালীর সব দীপ নিভে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিল—খেজুরীর দিকে তৃণমূলীরা গুলি চালায়। কিন্তু তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছিলেন—তাঁর রিপোর্টে ছিল—খেজুরীর দিক থেকেই (অর্থাৎ কমরেডদের বন্ধুকের নল-দ্বারা) গুলি বর্ষিত হয়। সাংবাদিকদের মতে, সংখ্যাটা দিনে কয়েক হাজার।

আহত ধর্ষিতাদের দেখতে বুদ্ধিজীবীরা যখন নন্দীগ্রামে যেতে চেয়েছেন, তখন বারবার তাঁদের আটকানো হয়েছে। ১৪৪ ধারা

(এরপর ৪ পাতায়)

‘ফিমেল হ্যাডলি’ ধৃত আমেরিকায়

(১ পাতার পর)

আক্রমণের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারে!

পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত আমেরিকান মুসলমান কোলম্যান হ্যাডলির আমেরিকায় বসে ভারতে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের পরিকল্পনার কথা প্রকাশ্যে আসার একমাস বাদে জেহাদি জানের গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটল। সে ভারতে এবং ডেনমার্কে জেহাদি হামলার অভিযোগে অভিযুক্ত। সেই প্রথম হাইপ্রোফাইল মহিলা সন্ত্রাসবাদী। তার সঙ্গীসাথীরা সবাই দক্ষিণ এশিয়ায়, বিশেষত ভারত ও পাকিস্তানের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। CC # ৩-তার অনলাইন পরিচয়।

আমেরিকান সরকারি সূত্রে উদ্ধৃত করে সি এন এন জানিয়েছে—জানে ওরফে ফতিমা লা রোজে ইতিমধ্যে দলভারী করতে এবং জেহাদি তহবিল সংগ্রহ করতে সফল হয়েছে। এশিয়া, ইউরোপে কট্টর জেহাদিদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে। তবে সূত্রটি বিশেষ কোনও জেহাদি সংগঠনের নাম বলতে অস্বীকার করেছে। সাদা চামড়ার আমেরিকান জেহাদি-সন্ত্রাসবাদীদের নাম উঠে আসায় এবং ধরা পড়ায় ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থাগুলোকে বিশেষ করে পাশ্চাত্যের পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত নাগরিকদের ভারতে যাতায়াতের ভিসার ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক থাকার কথা বলা হয়েছে। যদিও ব্যাপারটা বেশ কঠিন। জনৈক ভারতীয় গোয়েন্দার কথায়, এটা এক দুঃস্বপ্ন।

আমেরিকার (গ্র্যাণ্ড জুরি) মুখ্য বিচারকের কথায় স্পষ্ট যে,—জানে ওরফে রোজে এবং তার সঙ্গী-সাথীরা অন লাইনে জেহাদী যোগাড় করছে। উদ্দেশ্য ইউরোপ এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী আঘাত হানা। বিশেষত, এমন সব মহিলা জেহাদিদের অনলাইনে যোগাযোগ করা হচ্ছে যাদের পাসপোর্ট আছে, হিংসাত্মক আক্রমণের জন্য ইউরোপ জুড়ে ঘোরাফেরা করার অভিজ্ঞতা আছে। জেহাদি জানে ২০০৮ থেকে ২০০৯-এর অক্টোবর পর্যন্ত জনৈক দক্ষিণ এশিয়ান জেহাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রেখেছিল। বৈদ্যুতিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার বক্তব্য ছিল—জেহাদে যোগ দিয়ে শহীদ হওয়া। এমনকী ইউরোপ থেকেও সে আত্মঘাতী জেহাদি যোগাড়ে সমর্থ হয়েছিল। এদিকে ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের এক অফিসারের কথায়—আমেরিকা ও ইউরোপ থেকে যারা আসছে তাদের মধ্যে কারা আল কায়েদা বা জেহাদি তা জানতে পারা বেশ অসুবিধাজনক।

এখানে উল্লেখ্য, ডেভিড কোলম্যান হ্যাডলিকে আমেরিকার ভারতীয় দূতাবাস থেকে যে ভিসা ইস্যু করা হয়েছিল তার কাগজপত্র হ্যাডলি ধরা পড়ার পর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বামুন চিনি পৈতা প্রমাণ

(১ পাতার পর)

কোনও একদিন ‘উদ্বাহু বামন’-এর মতই অধম কলমচীর প্রবল সাধ এবং গুরুতর সমস্যা হয়েছিল এ কথা উপলব্ধি করতে যে আগমার্কা ‘গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল সেকুলার কমিউনিষ্ট’ চিনি কিসে? বিগত সত্তর/আশি বছরে মাতৃভূমির প্রতিটি বিপদে-আপদে-সংকটে এঁরা এত বিচিত্র মূর্তি এবং ময়ূর-পেখমের বিচিত্র বর্ণ ধারণ করেছেন যে মূঢ়মতি এবং মুগ্ধ কলমচীর বিভ্রান্তি কোনভাবেই দূর হয়নি। এখনও তার ধন্ধ রয়েই গিয়েছে—এঁদের স্বরূপটি ঠিক কি প্রকার। টম বটোমোরের বিখ্যাত গ্রন্থে (A Dictionary of Marxist Thought, Entry : Morals) সম্পাদক মন্তব্য করেছেন, মার্ক্সীয় নীতিবোধ নিতান্তই গোলমেলে (paradoxical)। ১৮৫৩ সালের একটি রচনায় কার্ল মার্ক্স ‘বিপ্লব আমদানির স্বার্থে’ ("in bringing about the revolution") বৃটিশ ঔপনিবেশিকদের ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারকেও অনুমোদন করতে দ্বিধা করেননি। লেনিন বলেছিলেন, শোষক শ্রেণীকে ধ্বংস করে যা কিছু শোষিত শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করে কম্যুনিষ্ট সমাজ তৈরী করে (পড়ুন : যা কিছু মার্ক্সবাদের ঝাণ্ডাধারীদের ক্ষমতা বা মন্ত্রীত্বের আসন দখল করতে এবং সেখানে ‘যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ’ কাঁঠালের আঠার মতো লেগে থাকতে সাহায্য করে) তাই মার্ক্সীয় নীতিসম্মত। সুতরাং ‘সদা সত্য কথা বলিবে, কদাচ মিথ্যা কথা বলিবে না, চুরি করিবে না, অপরকে পীড়ন করিবে না’ ইত্যাদি ছেলে-ভুলানো নীতিবাক্য বিপ্লবী কম্যুনিষ্টদের জন্য নয়। ক্ষমতায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য মিথ্যাচার, সুবিধাবাদ, সন্ত্রাসবাদ, গণহত্যা এমন কী সেকুলারিজমের নামে সাম্প্রদায়িক তোষণ এবং অপরের মাতৃভূমির বিভাজন রীতিমতো মার্ক্সবাদ সম্মত। অধম কলমচী বাধ্য হয়ে ‘অপরের মাতৃভূমি’ শব্দটিই ব্যবহার করছে, কারণ খাঁটি মার্ক্সবাদীর মাতৃভূমি বলে কিছু হতে পারে না। তাঁরা দীর্ঘকাল ভারতমাতার অঞ্চ লছায়ায় পরিপুষ্ট এবং বর্ধিত হলেও রেসিডেন্ট এবং পার্মানেন্ট নন-ইণ্ডিয়ান হয়েই রয়ে গিয়েছেন। তাঁদের ‘একমাত্র পিতৃভূমি’ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন নামে অধুনা বিলুপ্ত রাষ্ট্র। ‘পিতৃবিয়োগ’-এর পরে তাঁরা আর লজ্জায় পিতার নাম উচ্চারণ করতে চান না।

অনেক বিনিদ্র রজনীর পরে অধম কলমচীর গোলমেলে ঝাপসা বুদ্ধিতে কিঞ্চিৎ উপলব্ধি হতে আরম্ভ করেছে—যে সমস্ত ‘ভারতের কমিউনিষ্টরা’ (তাঁরা এখনও ‘ভারতীয় কমিউনিষ্ট’ হয়ে উঠতে পারেননি, সম্ভবতঃ পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করে বিলুপ্ত হওয়ার আগে তা সম্ভবও নয়) কোনও ধর্মেই বিশ্বাস করেন না, বিশেষতঃ হিন্দু ধর্মের ছায়া মাড়ালে অশুচি বোধ করেন, অথচ আল্লাহ্‌র রসুলকে নবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করেন, তিনিই খাঁটি সেকুলার প্রগতিশীল মার্ক্সবাদী। এ বিষয়ে প্রাতঃস্মরণীয় এম. এন. রায়-এর ‘ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান’ দ্রষ্টব্য, ‘...মহাপুরুষ মোহম্মদ তাঁর পূর্বের ও পরের যে কোন পয়গম্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হবার যোগ্য। জগতে যত অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে, ইসলামের প্রসারতা তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ’ (পৃঃ ৮-৯)। বার্ট্রাণ্ড রাসেল মার্ক্সবাদকে বলেছিলেন, "Christian heresy" যা ব্যাপকতর অর্থে "Semitic heresy"। সেমিটিক ধর্মগুলি (এই মুহূর্তে বিশেষ করে ইসলাম) সারা পৃথিবীতে একমাত্র সত্য ও প্রকাশিত ধর্ম বা ‘রেভেলেশন’ ছক্টত্মন্দ্ধন্দ্বস্ত্রব্ধনস্পঃক্ট্রা আমদানী-রপ্তানি করে থাকে, মার্ক্সবাদের কারবার রিভোল্যুশন আমদানি-রপ্তানি নিয়ে। ভিন্ন মোড়কে প্রায় একই পণ্যের কারবারীদের মধ্যে নিবিড় ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধও ‘মার্ক্সবাদ-সম্মত’ হতে বাধা কোথায়, বিশেষতঃ কমরেড বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য সহ তথাকথিত ‘ভারতের’ কম্যুনিষ্টরা যখন বিষম ঠেকায় পড়েছেন?

অধম কলমচীর মনে পড়ে আরও একজন প্রাতঃস্মরণীয় মার্ক্সবাদী এবং পাঞ্জাবের নেতা গঙ্গাধর অধিকারীকে, যিনি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ‘বিজ্ঞানসম্মত মার্ক্সবাদ’-এর গভীর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সহযোগে ‘প্রমাণ’ করে দিয়েছিলেন, ভারতবর্ষ একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র এবং প্রতিটি ধর্মীয়, ভাষাগত, সংস্কৃতিগত জাতি, বিশেষতঃ ‘সেমিটিক ভ্রাতা’ মুসলমানেরা অবশ্যই একটি পৃথক জাতি। মহামতি লেনিনের সেই ঐতিহাসিক উক্তিও অবশ্যই স্মরণীয়, ‘প্রতিটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মৌলিক এবং শাশ্বত অধিকার।’ সুতরাং একজন খাঁটি সেকুলার বিপ্লবী মার্ক্সবাদী ঘোষণা করতেই পারেন, পাকিস্তানের দাবী ন্যায্য এবং মার্ক্সবাদসম্মত। ১৯৪৩ এর বোম্বাই কংগ্রেসে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি সেই মর্মেই প্রস্তাব পাশ করেছিল এবং ১৯৪৬-এ জিন্নার ‘ডাইরেক্ট অ্যাকশন’ সমর্থন করেছিল। আমাদের অবশ্যই ভুলে গেলে চলবে না আরও একজন সেকুলার প্রগতিশীল মার্ক্সবাদীর কথা, যিনি ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে কেরলে বিপ্লব আমদানি করবার জন্য (পড়ুন : মুখ্যমন্ত্রীত্বে আসীন হওয়ার জন্য) মুসলমানদের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন একটি জেলা, যাকে দুষ্ট এবং গোঁড়া সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের কেউ কেউ বলে থাকেন, ‘মোল্লাপুরম্’। তাঁর নাম ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ।

‘মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা’। বঙ্গীয় সি পি এমের মুখ্যমন্ত্রী কমরেড বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য তাঁর পূর্ববর্তী সেকুলার ও ইসলাম প্রেমিক মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা ছাড়া আর কিই বা করতে পারেন? তিনি তাঁর ‘সীমিত ক্ষমতায়’ সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে মুসলিম সংরক্ষণের ছুঁচটিকে প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, যাতে অদূর ভবিষ্যতে সেটি ফাল হয়ে হিন্দু সমাজের ভিত্তিতে লাঙ্গল চষে দেয়, বিশেষতঃ ধর্মান্তরণে উৎসাহ যোগায় এবং পুনরায় দেশ-বিভাজনের রাস্তা খুলে দেয়। সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের নেতা শ্যামাপ্রসাদের গুরুতর অপরাধ ছিল—তিনি মুসলমানদের ন্যায্য পাওনা (অবিভক্ত বাংলা) অস্বীকার করে প্রস্তাবিত পূর্ব পাকিস্তানকে ভাগ করার দাবী করেছিলেন এবং ক্ষীয়মান বাঙালী হিন্দুদের জন্য আদায় করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ—যে অপরাধ সেকুলার মার্ক্সবাদীদের চোখে ক্ষমার অযোগ্য। ভারত বিভাজন অবশ্যই ন্যায্য, কিন্তু পাকিস্তান বিভাজন গুরুতর অপরাধ—এইটিই মার্ক্সীয় এথিক্স। সেই ‘ঐতিহাসিক ভুল’কে সংশোধন করবার জন্য মুখ্যমন্ত্রী তাঁর শাস্ত্রসম্মত কর্তব্য করতে এগিয়ে এসেছেন—এই না-পাক-পশ্চিমবঙ্গ থেকে যত দ্রুত সম্ভব আরও একটি পাকিস্তান সৃষ্টি। মুসলিম সংরক্ষণ এর একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। আগমার্কা সেকুলার নেতারা অবশ্যই দোয়া করবেন—কমরেড ভট্টাচার্য যেন পশ্চিমবাংলায় দার-উল-ইসলাম সৃষ্টির মতো একটি সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারেন।

‘সাইবার ক্রাইম’

(১ পাতার পর)

প্রটোকল’ বিষয়ে অবহিত নন। যদিও এটা কীভাবে ব্যবহার করা বা ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত তা জানা বিশেষ জরুরী। এই পদ্ধতি ২৬/১১-র মুম্বাই হামলার সময়ে ব্যবহার করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে ভারতীয় তথ্য-প্রযুক্তি আইনেও সাইবার অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে বলে সানি বাগেলা মন্তব্য করেছেন। সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলোও আদৌ নিরাপদ নয়। এসব ক্ষেত্রে হ্যাকাররা ব্যবহার, অপব্যবহার করে সহজেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদান প্রদান করতে পারে।

এরই নাম আইনের শাসন?

(৩ পাতার পর)

জারী করে তাঁদের বন্দী করে রাখা হয়েছে বহু দূরে—এই ব্যাপারে হাইকোর্টও সরকারের নিন্দা করেছে। সম্মানীয় বুদ্ধিজীবীদের পুলিশ ও ক্যাডাররা বিশ্রী গালিগালাজ করেছে, দৈহিক নির্যাতন করাও হয়েছে তাঁদের অনেককে।

অবশ্য এই নারকীয়তার সূত্রপাত ১৯৭০ সালের সাঁইবাড়ির ঘটনা দিয়ে। এই শতাব্দীর সেই নৃশংসতর খুনের ঘটনায় প্রাণ দিয়েছিলেন দুই ভাই ও এক গৃহ-শিক্ষক। তাঁদের রক্তমাখা ভাত তাঁদের মাকে জোর করে খাওয়ানো হয়েছিল, শিশুকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল আগুনে। পরে অবশ্য আরও দুই ভাই হতাহত হয়েছেন।

জানলাম কয়েকজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল—হাইকোর্টও সেই রায় বহাল রেখেছিল। কিন্তু ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে সেই মামলা প্রত্যাহার করে নেন। জঘন্য অপরাধীদের একজন এখন মন্ত্রী (নিরূপম সেন)। একজন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রার হয়েছিল (রজত ব্যানার্জী), একজন নাম ভাড়িয়ে (মানিক রায় ওরফে অনিল বসু) বহুবার সাংসদ হয়েছে। ৩২১ নং ধারায় আছে—সরকার কোনও মামলা তুলে নিতে পারে, কিন্তু খুনের মামলা এর আওতায় পড়ে না।

১৯৭০ সালের বন্‌সাইলাল বনাম চমনলালের মামলায় সুপ্রীম কোর্টও এই ধরনের মন্তব্য করেছিল। কিন্তু এরা এখনও মুক্ত আছে—কারণ সীজারের স্ত্রীর মতো কমরেডরাও আইনের উর্ধে। আরও জানা গেছে—ওই মামলার নথি হাইকোর্টেই নেই। এটাও এক মার্ক্সীয় ম্যাজিক যা আইনভঙ্গকে শিল্পে পরিণত করেছে।

দুই মন্ত্রী বছর তিরিশেক ধরে মহাকরণ আলো করে আছেন—তাঁদের বিরুদ্ধে আছে জামিন-অযোগ্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। কিন্তু পুলিশ তাঁদের চিনতে পারছে না এখনও। অথচ সম্প্রতি একজন ও.সি.-কে বন্দী করে বিনিময়ে ২৩ জন মহিলাকে ছাড়িয়েছেন মাওবাদীরা—জানা গেছে ওই মহিলাদের বিরুদ্ধে কোনও মামলাই নেই। সত্যি সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ!

এক দশক কেটে গেলেও সূচপুর গণহত্যা মামলার শুনানী শুরু হয়নি কেন? কেন ২৫ বার শুনানী স্থগিত রাখতে হয়েছে? বীরভূমে এক হত্যা-মামলার রায়ে ৩৭ জনের (মার্ক্সবাদী) শাস্তি হয়েছে—কিন্তু রায় বেরোতে ২৬ বছর লেগেছে কেন? একজন মাননীয় বিচারপতির বিরুদ্ধে ‘লালা, তুই পালা’ ধ্বনি দেওয়া হলো কেন, কেনই বা তাঁকে বদলী করা হলো? ছোট আঙারিয়ার গণহত্যা-মামলার রায়ের কি হলো?

জঙ্গলমহলের মানুষ পিঁপড়ের ডিম, ডুমুর, লতাপাতা ইত্যাদি খেয়ে আছে। না আছে পানীয় জল, না আছে শিক্ষা-ব্যবস্থা, না আছে হেলথ্ সেন্টার। কিন্তু মাওবাদী খোঁজার নাম করে ছেলেরা মেয়ে সেজেছে কিনা, সেটা দেখার জন্য কাপড় খুলে দেখা হয়েছে। হত্যা করা হয়েছে বুবন ও ভদ্র শবরকে—সন্দেহটা রয়েছে কিন্তু পুলিশের ওপরেই। সেই বিদ্রোহ জন-বিদ্রোহ বলেই কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ বাহিনী ছয় মাসেও দমন করতে পারেনি ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ মানুষকে। লাখ-লাখ টাকা খরচ করা হয়েছে পুলিশী ব্যবস্থার জন্য—এই টাকায় উন্নয়নের কাজ হলে কিন্তু শান্তি ফিরে আসত। অথচ যৌথ বাহিনী জায়গা করে দিল ক্যাডার-বাহিনীকে।

এটা আইনের শাসন? আমরা দুঃখিত—পশ্চিমবঙ্গ নামক নরককুণ্ডটা আইনের শাসনে আছে, এই ছবিটা মেনে নিতে পারছি না। প্রখ্যাত সংবিধান বিশেষজ্ঞ এ. ভি. ডাইসী লিখেছেন, 'Not only with us no man is above the law, but here every man, whatever be his rank and condition, is subject to the ordinary law of the realm...।’

তাঁদের সকলেই আইনের চোখে সমান এবং একই আইনের অধীন। স্যার জেনিংসও জানিয়েছেন—আইনের শাসনের অর্থ হল ‘people are ruled by law and law alone।’

কিন্তু ‘মহান’ পশ্চিমবঙ্গে শাসকদলের নেতা ও হার্মাদরা আইনের উর্ধে। এখানে আছেন দুই ধরণের মানুষ—‘আমরা’ ও ‘ওরা।’ সুকুমার রায়ের কবিতাটা মনে পড়ছে—

‘আমরা ভাল, লক্ষ্মী সবাই—
ওরা ভারী বিশ্রী,
ওরা খাবে নিমের পাচন—
আমরা খাব মিছরি।’

আইনের শাসনে এমনটা হয়?

নিশাকর সোম

জনসাধারণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন সি পি এম

বর্তমানে রাজ্য-রাজনীতি আলোড়িত হচ্ছে সাঁইবাড়ি-হত্যাকাণ্ড নিয়ে। যদিও এই-ঘটনা ৪০ বছরের আগের। সেই ঘটনায় অভিযুক্ত ছিলেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন, হুগলির প্রাক্তন সাংসদ অনিল বসু এবং রাজ্যের নেতা তথা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিনয় কোঙার। সাঁইবাড়ি-র সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট পতনের পরে।

এই প্রসঙ্গে পুরানো কথা তুলতে ইচ্ছা করে। ১৯৬৭ সাল থেকে সিপিএম-এর রাজনৈতিক মতিগতি নানা সময়ে নানা ভাবে পাল্টেছে। ১৯৫৭ সালের আগে সিপিএম-এর বক্তব্য ছিল—"জোর জুলুম-কে টক্কর মেঁ একাই হামারা নারা হ্যায়।" এই স্লোগানটি ১৯৬৭ সালের পরে পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় "হামসে জো টক্‌রায়েঙ্গে মিটটিমে মিল যায় গে"। একাই থেকে মাটিতে মিলিয়ে দেবার বিবর্তন। পরে সাঁইবাড়ি প্রসঙ্গে যাচ্ছি। আগে ফ্ল্যাশ-ব্যাকে দেখা যাক।

১৯৬৭ সালের লোকসভা নির্বাচনের পরে কংগ্রেসের একচ্ছত্র ক্ষমতার অবসান ঘটে। এরপরে বিভিন্ন রাজ্য-বিধানসভা নির্বাচনেও কংগ্রেস অপসারিত হয়। ১৯৬৭ সালের চতুর্থ লোকসভার সাধারণ নির্বাচনের পরে সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির নূরমহলের অধিবেশনে 'নূতন পরিস্থিতি এবং আমাদের কর্তব্য' শীর্ষক প্রস্তাবে বলা হয়—'দেশে অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে রাজনৈতিক সঙ্কট দেখা গেছে। এই রাজনৈতিক সঙ্কটকে বিপ্লব সঙ্কটে পরিণত করতে হবে।' এরই সূত্র ধরে পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম-এর মধ্যে অতিবিপ্লবী চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটে। এরই সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির এই অধিবেশনে ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টের কাজ সম্পর্কে একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়। তাতে বলা হয় অর্থনৈতিক সংগ্রাম-কে রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত করতে হবে।

১৯৬৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে দু'টি পরস্পর বিরোধী ফ্রন্ট গঠিত হয়। একটি সিপিএম-এর নেতৃত্বে ইউনাইটেড লেফট ফ্রন্ট (এস ইউ সি-ও তাতে ছিল)। আর একটি অজয় মুখার্জি তথা বাংলা কংগ্রেস-এর নেতৃত্বাধীন পিপলস ইউনাইটেড লেফট ফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল। এই উভয় ফ্রন্ট নির্বাচনী প্রচারে একে অপরকে মাটিতে মিলিয়ে দেবার স্লোগান তোলে। কিন্তু নির্বাচনের পর উলফ এবং পালফ মিলে ইউএস-ইউনাইটেড ফ্রন্ট তথা যুক্তফ্রন্ট গড়ে ওঠে। সিপিএম মন্ত্রিত্বের স্বাদ পেল। এখানে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করতে হয়। রাজ্য সিপিএম নেতৃত্ব ঠিক করেছিল আবদুল্লা রসুলকে মন্ত্রিসভার পুনর্বাসনমন্ত্রী করা হবে। জ্যোতি বসু তার বদলে সেখানে তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুগামী নিরঞ্জন সেনকে মন্ত্রী করেন। জ্যোতিবাবুর যুক্তি ছিল—"মুসলমানকে পুনর্বাসন মন্ত্রী রাজ্যের মানুষ মেনে নিতে পারবে না।" এরপর থেকেই সিপিএম-এর নেতা-কর্মীদের মেজাজের ডিগ্রি বাড়তে লাগলো।

এর পরবর্তীতে প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অবসানের পর পুনরায় বিধানসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রাক্কালে এক জনসভায় সিপিএম-এর বি.টি. রণদিভে বলেন—"বোধহয় এটাই শেষ নির্বাচন।" হরেকৃষ্ণ কোঙার বোমা তৈরির সব কৃৎকৌশল, পারকিউশন রড ইত্যাদি সবিস্তারে বর্ণনা করে দিলেন। এরপরেই সিপিএম-এর সংহার মূর্তি দেখা গেল। সিপিআই-এর অফিসে বোমা মারা হলো। সিপিআই নেতা-কর্মী খুন হলেন। আরএসপি-এর সঙ্গে সিপিএমের দাঙ্গা হলো ঝাড়মাঝা গ্রামে।

এই সূত্রেই সাঁইবাড়ি কাণ্ড। এই সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডের পর হরেকৃষ্ণবাবু বলেছিলেন যে এই সাঁইদের মতো যত আছে তাদেরকে মারতে সিপিএম দ্বিধা করবে না।

শোনা যায় সাঁইবাড়ির ঘটনার পর জ্যোতি বসু নাকি হরেকৃষ্ণবাবুর সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু বর্ধমানের সাঁইবাড়ি ঘটনার জন্য মূলত হরেকৃষ্ণ কোঙারকে দায়ী করা যায় নাকি?

প্রথম যুক্তফ্রন্টের পতনের পর সিপিএম-এর স্লোগান ছিল—"সরকার বসাও"। তারপর বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম আমলে স্লোগান উঠল "বামফ্রন্ট সরকার সংগ্রামের হাতিয়ার—একে চোখের মণির মতো রক্ষা করতে হবে।" তারপর সালকিয়া প্লেনাম থেকে বিপ্লবী আলখাল্লা ত্যাগ করে কেন্দ্রীয় সরকার-এর ক্ষমতা দখলের 'স্বপ্ন' দেখা শুরু হলো। এর জন্য গরীব মানুষকে ত্যাগ করে পুঁজিপতিদের সাহায্যপ্রার্থী হতে দেখা গেল।

সিপিএম-এর পার্টি-কর্মসূচীতে লেখা বিদেশী পুঁজি-একচেটিয়া পুঁজি-সামন্তবাদ-বিরোধী জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা নস্যাৎ করে বিদেশি পুঁজিকে আহ্বান, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দরিদ্র কৃষকদের উচ্ছেদ করে গ্রামে গ্রামে পার্টির নেতৃত্বে নয়া সামন্তবাদী ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হলো। যেসব নেতা একবেলা খেতেন, ভাল পোশাক-পরিচ্ছদ পরতে পারতেন না, যাঁরা ছিলেন গ্রামের মানুষের কাছের মানুষ, তাঁরা বাড়ি করলেন, কম করে দু'চাকা গাড়ী করলেন, ধীরে ধীরে ধনিক-বণিক-এ পরিণত হলেন। ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সিপিএম গ্রামের গরীবদের কাছ থেকে। একটি মাত্র লক্ষ্য নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। পার্টির মধ্যেও একশ্রেণী সৃষ্টি হলো—যে-শ্রেণী বিধায়ক-সাংসদ-রাজ্যসভার সদস্য হবার পথে এগোলেন। নেতাদের বাড়ির কুকুর-বেড়াল ছাড়া সকলেই চাকরিতে অথবা ব্যবসাতে লেগে গেলেন। খালি 'সাম্প্রদায়িকতার' বিরুদ্ধে উদ্‌গার উগরে দেওয়া হলো। কেন্দ্রে যাবার জন্য—কংগ্রেসের আঁচল ধরে—কেন্দ্রে সর্দারি করা হতে লাগলো। রাজ্য-বামফ্রন্টের শরিকদের অবহেলা-অবজ্ঞা লাঞ্ছনা করে একদলীয় শাসন কায়েম করার পথে চলে গেল। ফলে বামফ্রন্টের দলগুলিও গোপনে গোপনে বিরোধীদের মদত দিল। ফলে আজ সিপিএম সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তাই বিপদে পড়ে সিপিআই-এর প্রশংসা করা।

সিটুর সম্মেলনে অন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে আহ্বান করে আমন্ত্রণ জানানো হল। অথচ ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠন-কৃষকসভা সবই ভেঙে দিয়ে সিপিএম ভাঙনের দৈত্যের ভূমিকায় গেছিলো। সিপিএম-পার্টির নেতা থেকে নিচের তলা পর্যন্ত—অহঙ্কারী-মার-দাঙ্গা করার মনোভাব তৈরি হলো। এই মনোভাব তৈরির জন্য—নেতারাই দায়ী। নির্বাচনটাকে টোয়েন্টি-টোয়েন্টি ম্যাচে পরিণত করা হলো। ভাবটা এইরকম—"ভোটার শালারা আমাদের ভোট না-দিয়ে যাবে কোথায়?" অস্ত্রের ঝনঝনানিতে মুখরিত হলো নির্বাচনী প্রচার। ধাক্কা আসতে লাগলো অভ্রংলেহি মুখ্যমন্ত্রীর কাজ-কর্মে, সঙ্গে তখন দোসর শিল্পমন্ত্রী। পার্টিকে না-জানিয়ে, বামফ্রন্টে আলোচনা না-করে টাটার সঙ্গে গোপন চুক্তি করা হলো। তার ফলে আজ রাজনীতিগত- ভাবে সিপিএম-এর নাভিশ্বাস উঠেছে। বিধানসভায় বিরোধীরা সরব। মুখ্যমন্ত্রী তথা বামবিধায়কগণ বিরোধীদের সমালোচনার মোকাবিলা করতে ব্যর্থ। এখন তো মন্ত্রিসভায় বুদ্ধগোষ্ঠী—আর বুদ্ধ-বিরোধীগোষ্ঠী তৈরি হয়ে গেছে। যে-শিল্পসচিব একদা বুদ্ধবাবুর প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন—আজ তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমলাদের একাংশ মমতা-প্রণব-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। "নিজ দোষে কনকলঙ্কা আপনি ডুবাইলা।" এখন তো সিপিএম-এর রাজনৈতিক অন্তর্জলি-যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। তাই এখন মরিয়া হয়ে কংগ্রেসকে তৃণমূলের কাছ থেকে সরিয়ে আনার রাজনীতিতে সচেষ্ট। কি হীন অবস্থা! নিজস্বমাটিতে অর্থাৎ বামশক্তিতে কংগ্রেস-তৃণমূল শক্তির বিরুদ্ধে জনগণকে সংহত করার 'কঠিন' কাজটি করতে নারাজ তারা। খালি কৌশলবাজি। এক কথায় বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি।

২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে দুই যুযুধান শক্তির শক্তিমত্ততায়—পশ্চিমবঙ্গে গৃহযুদ্ধের অবস্থা হবেই। শান্তিপ্রিয় মানুষজনকে শান্তির পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তৃতীয় পক্ষকে তাই উদ্যোগ নিতেই হবে।

□□

এখন তো সিপিএম-এর রাজনৈতিক অন্তর্জলি-যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। তাই এখন মরিয়া হয়ে কংগ্রেসকে তৃণমূলের কাছ থেকে সরিয়ে আনার রাজনীতিতে সচেষ্ট। কি হীন অবস্থা! নিজস্বমাটিতে অর্থাৎ বামশক্তিতে কংগ্রেস-তৃণমূল শক্তির বিরুদ্ধে জনগণকে সংহত করার 'কঠিন' কাজটি করতে নারাজ তারা। খালি কৌশলবাজি।

□□

অ রকম

এম বি এ পঞ্চায়েত প্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বর্তমান পুরুষশাসিত সমাজে যেখানে নারীদের অধিকার প্রায় নেই বললেই চলে, লাঞ্ছনা বা গঞ্জনা যাদের প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী, যেখানে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই দুষ্কর, এহেন সমাজে জয়পুরের ছবি রাজাওয়াত ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে অবশ্যই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি শুধু আপন অস্তিত্ব টিকিয়েই রাখেননি, সেই অস্তিত্ব জাহিরও করেছেন। জয়পুরের বাসিন্দা বছর তিরিশের ছবি রাজাওয়াত সম্বন্ধে সর্বাগ্রে যেটা বলা দরকার তা হলো বিভিন্ন নামী দামী কর্পোরেট সংস্থার সঙ্গে কাজ করার পর এক বিলাসবহুল জীবনের যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বিসর্জন দিয়ে তাঁর স্থায়ী ঠিকানা এখন জয়পুর থেকে ৬০ কি.মি. দূরের সোদা গ্রামে। তিনি এখন সোদা গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান। ব্যাঙ্গালোরের ঋষি ভ্যালিতে ছাত্রীজীবনের সূচনার পরে দিল্লীর লেডি শ্রীরাম কলেজ থেকে তাঁর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন এবং সেইসঙ্গে পুণে থেকে ম্যানেজমেন্ট পরীক্ষাতেও সসম্মানে উত্তীর্ণ। এরপর কর্মজীবনের স্রোতে গোটাপাঁচেক কর্পোরেট সংস্থার চাকরি। আর এই চাকরি করতে করতেই অজস্র ভোগবাদী আয়োজনের মাঝেও ভারতবর্ষের সনাতনী ত্যাগের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হলেন ছবি। তেন ত্যক্তেন

ছবি রাজাওয়াত

ভুঞ্জীথা— ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ, উপনিষদের এই বাণীই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

গত ৪ ফেব্রুয়ারি সোদা গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধানের আসনে বসা রাজাওয়াত বলছেন, "সোদার মানুষজনের সঙ্গে আমার সহজ মেলামেশা এবং বন্ধুর মতো আচরণের ফলে এখানকার মানুষ আমাকে আপন করে নিয়েছেন।" আর এই শিক্ষাটাই তিনি পেয়েছেন তাঁর ম্যানেজমেন্ট পাঠক্রম থেকে।

তাঁর কাছে সমাজসেবা সবসময়েই প্রাধান্য পেয়েছে, কারণ এই জিনিসটা তাঁর রক্তে আছে। আপাতত গ্রামের উন্নয়নই তার কাছে এক এবং একমাত্র লক্ষ্য। গ্রামের লোক সঠিকভাবে পানীয় জল পেল কী না, রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ এবং হাসপাতাল নির্মাণের কাজ সঠিকভাবে হচ্ছে কী না' তা তদারকিতেই এখন দিন কাটছে তাঁর। নিজে এম.বি.এ., তাই যোগ্যতা মাফিক কর্মসংস্থানের ব্যাপারে তিনি খুবই সতর্ক। সেই কারণে কর্মহীনতার অভিশাপ যাতে সোদা গ্রামকে না স্পর্শ করতে পারে তার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট তিনি। কাজের সুবিধার জন্য জিন্স আর টি-সার্টেই তিনি স্বাচ্ছন্দ্য, বোধহয় পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যও!

অসমে ভূমি-রাজস্বমন্ত্রী রাজ্যে ভূমিহীন কত জানেন না

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সাম্প্রতিক এক সরকারি সমীক্ষায় অসমে উন্নয়নখাতে মাথাপিছু গড় ব্যয় সর্বভারতীয় গড়ের তুলনায় অনেক কম বলে জানা গেছে। অথচ যখনই বাজেট বরাদ্দ অথবা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আকাশ-ছোঁওয়া দ্রব্যমূল্যের কথা ওঠে তখনই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ কথার ফুলঝুরি ছোটান। তাঁর দরদ উথলে ওঠে গরীব অসমবাসীদের জন্য। কিন্তু ঘটনা হলো নানা সরকারি রিপোর্ট এমনকী বিধানসভায় দেওয়া মন্ত্রীদের জবাবী বক্তব্যে রাজ্যের চিত্রটা একেবারেই বিপরীত। গত ১৮ মার্চ রাজ্যের ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী ভূমিধর বর্মণ রাজ্যে ভূমিহীনদের বিস্তারিত তথ্য জানিয়েছেন। তাঁর কথায় অসমে এখন ভূমিহীনদের সংখ্যা ১,৭৭,১৯৫ জন।

বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী শ্রীবর্মণ সভাকে জানিয়েছেন—রাজ্যের মরিগাঁওয়ে ২৬,৩৬৫ জন, নগাঁওয়ে ৮৩ জন, শোণিতপুরে ৭,৩৬১ জন, শিবসাগরে ৫,৬৭৪ জন, জোড়হাটে ১১,০৬৮ জন নাগরিক ভূমিহীন। একইরকমভাবে গোলাঘাটে ৫,৪৬৬ জন, কাছাড়ে ১৪,৪৫৮ জন, নলবাড়িতে ২,৫৭৫ জন, হাইলাকান্দিতে ২,৭১৫ জন, গোয়ালপাড়ায় ১৩,৪০৩ জন, চিরাঙে ২০,৯০৮ জন, লখিমপুরে ৭,৪১১ জন, দরঙে ১৯,৭৬১ জন এবং কামরূপ মহানগরে ৭,১৫০ জন ভূমিহীন নাগরিক বসবাস করেন। এই বয়ানও অসম্পূর্ণ। রাজ্যের অন্যান্য জেলার এই সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি। ১৪টি জেলা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১২,৮৯৮ জন

তরুণ গগৈ

ভূমিধর বর্মন

অসমবাসী বাঁধের উপরই বসবাস করছেন। এছাড়া, বিভিন্ন রাজ্য থেকে চা-বাগানে বা অন্যত্র শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে আসা এবং প্রায় স্থায়ী হয়ে যাওয়া মানুষদের হিসাব যে এখানে নেই তা হলফ করে বলা যায়। এই শ্রমিকদের একটা বড় অংশই ভোটার এবং তারা চা-বাগানের জমিতেই অস্থায়ী বাসস্থানে জীবন কাটিয়ে দেন। শাসক দলের প্রধান ভোটব্যাঙ্ক তারাই। চা-শিল্পে উত্তর ভারত থেকে কাজ করতে আসা কেউ কেউ বুদ্ধি, মেধা ও সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিধায়ক, সাংসদ ও কেন্দ্র এবং রাজ্যে মন্ত্রীপদও অলংকৃত করে চলেছেন। আবার যাদের নাম ভোটার তালিকাতেই ওঠেনি অজ্ঞতার কারণে, ভিক্ষাবৃত্তি, স্টেশন-বাজারে খুবই ছোটখাটো ব্যবসা, হকারি করে এমনকী বাল্য-কৈশোরকে জলাঞ্জলি দিয়ে পথে-ঘাটে-ট্রেনে ম্যাজিক দেখিয়ে জীবনযাপনের রসদ সংগ্রহ করে থাকে, তাদের কথা ভাবছে কে? এদের হিসাব কোথায়?

স্বাধীনতার ৬২ বছর বাদেও অসমে বাস্তবিক কতজনের মাথার ওপরে ছাদ নেই তা ঈশ্বর ছাড়া বোধ হয় কেউ জানেনা। আর শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অট্টালিকায় অনেক কষ্ট করে মন্ত্রী-আমলারা এই হতভাগ্যদের হিসাব কষেন। আর বিরোধীরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেই হয়তো ইতিকর্তব্য সমাপ্ত করেন। ভূমিহীনরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যান।

মেঘালয় সীমান্তে বি ডি আর-এর আক্রমণ

সংবাদদাতা ॥ প্রায় মাসদুয়েক আগে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফরে এসেছিলেন। সরকারের কাছ থেকে ব্যাপক অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাংলাদেশে ফিরেছেন। অথচ ইতিমধ্যেই মেঘালয়ের ভারত-বাংলাদেশ সংলগ্ন জয়ন্তিয়া পার্বত্য এলাকার মুক্তাপুরে বাংলাদেশের দিক থেকে যথেষ্ট বিপদ-সংকেত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে, বি ডি আর-এর আক্রমণে আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা বি এস এফ এর কাছে একরকম ধর্ণা দিয়েছে বলা যায়।

মুক্তাপুরকে বাংলাদেশের এলাকা দাবী করে সে দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী স্থানীয় গ্রামবাসীদের উপর গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। জবাবে বি এস এফও গুলি চালালে নিয়মিত যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। বি এস এফ সূত্রে জানা গিয়েছে গত ১৮ মার্চ বি ডি আর জওয়ানরা স্থানীয় জেলেদের উপরে গুলি চালায় যখন ওই জেলেরা বীরকিম্পলিং-এ এক পুকুরে মাছ ধরছিল। খবর পেয়ে বি এস এফ-ও পাল্টা গুলি চালায়। লক্ষণীয়, বি ডি আর-এর পিছনে থেকে স্থানীয় বাংলাদেশীরা ভারতীয়দের লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ছিল। বি ডি আর এখন ধুয়ো তুলেছে ওই এলাকা 'বিতর্কিত অঞ্চল' এবং সেক্ষেত্রে তাদের দাবী অগ্রগণ্য। এধরনের ঘটনা লাগাতার বৃদ্ধি পাওয়ায় বি এস এফ উদ্বিগ্ন। সম্প্রতি বি এস এফ-এর স্পেশ্যাল ডিরেক্টর জেনারেল (East) আর কে মেডেকর উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন করেন। মেডেকর গত ১৬ মার্চ রাজ্যের রাজ্যপাল আর এস মুসাহারির সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। মেডেকর জানিয়েছেন, মেঘালয়ের জয়ন্তিয়া পার্বত্য এলাকায় মুক্তাপুরের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উদ্বিগ্ন বি এস এফ শেষ পর্যন্ত সীমান্তে বাঙ্কার ও আউট পোস্ট-এর সংখ্যাবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আতঙ্কিত নলজুড়িতে গ্রামবাসীরা পালাতে শুরু করায় ইতিমধ্যে সেখানে বাঙ্কার নির্মাণ করে সেনা মোতায়েন করা হয়েছে।

অ্যামলিম্পিয়াং-এ (নলজুড়ি) ৩৫টি পরিবারের মধ্যে ২৯টিই তথাকথিত বিতর্কিত এলাকায়। রাজ্যপাল মুসাহারি সীমান্তে বসবাসকারী জনগণের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে মেডেকরকে অনুরোধ জানিয়েছেন। মেডেকর বলেছেন, "সীমান্তে বসবাসকারী জনগণকে সুরক্ষা দেওয়া আমাদের দায়িত্ব।" বলা বাহুল্য, বাংলাদেশে শাসক বদল হলেও ভারত প্রসঙ্গে মনোভাব বদলায়নি। এখানেই উঠে আসে ২০০২ সালের মানকাচার এলাকায় বি ডি আর-এর অনুপ্রবেশ এবং ১৬ জন জওয়ানকে ঠাণ্ডামাথায় খুন করার ঘটনার কথা। ২০০২ সালে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ১৬ জন জওয়ানকে দিন-দুপুরে তুলে নিয়ে গিয়ে বি ডি আর নির্মমভাবে হত্যা করে। এমন দ্বিতীয় কোনও উদাহরণ সভ্যজগতের ইতিহাসে বিরল।

মালদায় প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ লুঠ হচ্ছে

তরুণ কুমার পণ্ডিত ঃ মালদা ॥ মালদার প্রাচীন ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক স্থান গৌড় এক সময় বাংলার রাজধানী ছিল। কিংবদন্তী অনুসারে সেখানে সোনা বর্ষণ হয়েছিল। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ থেকে মাটি খোঁড়ার সময় প্রাচীন মুদ্রা ও কিছু সোনার গহনাও পাওয়া যায়। এখন সেই প্রাচীন মুদ্রা ও সোনার গহনার খোঁজে এই গৌড়ে বেআইনী ভাবে মাটি খুড়ছে দুষ্কৃতীরা। জানা গেছে, ইতিমধ্যে গৌড় থেকে উদ্ধার হওয়া প্রাচীন মুদ্রা, অষ্টধাতুর মূর্তি ও সোনার গহনা বস্তায় ভরে বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে। এই ঐতিহাসিক স্থানটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে কেন্দ্রীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ থাকলেও এখানে নিরাপত্তার তেমন কোনও ব্যবস্থা নেই। গৌড়ের এক কিলোমিটার দূরে পুলিশ ক্যাম্প থাকলেও প্রাচীন ইঁট ও সোনার গহনার লোভে স্থানীয় মানুষ গর্ত খুঁড়ে সেগুলির খোঁজ করে।

এখানে পুরাতত্ত্ব বিভাগের ৫৬ জন কর্মী রয়েছে। কিন্তু তারা স্থানীয় মানুষদের ভয়ে কিছু বলতে পারেন না। গত ফেব্রুয়ারি মাসে সশস্ত্র পুলিশ কর্মীরা গৌড়ে তল্লাশি চালিয়ে ইট ভর্তি দুটি বস্তা বাজেয়াপ্ত করে। গৌড়ে গেলে দেখা যাবে স্থানীয় বহু মানুষের বাড়ি প্রাচীন গৌড়ের ইঁট দিয়ে তৈরি হয়েছে।

স্থানীয় মানুষরা জানে এক সময়ে যেখানে গৌড় রাজ্যের টাঁকসাল ছিল ঠিক সেই সেই স্থানগুলিতেই গর্ত করা আছে এবং সেখান থেকে সোনার গহনা ও মূর্তির খোঁজ চলেছে।

পুলিশ সুপার ভুবনচন্দ্র মণ্ডল বলেন, এ ব্যাপারে খোঁজ খবর চলছে। ঘটনায় জড়িতদের ধরার চেষ্টা হচ্ছে। তবে স্থানীয় মানুষদের যতক্ষণ না ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো যাচ্ছে ততদিন এইসব প্রাচীন মুদ্রা ও গহনা চুরি বন্ধ হবে না বলেই মনে করছেন শিক্ষিত মানুষরা।

দলিত ভোটের তাগিদ

কংগ্রেস-বি এস পি দ্বৈরথ উত্তরপ্রদেশে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মিশন দলিত ভোট। তাই মায়াবতীর দেখানো পথেই হাঁটতে চলেছেন রাহুল গান্ধী। বি এস পি নেত্রীর জন্মদিনে যখন তাঁর কণ্ঠে ৫০ হাজারখানা হাজার টাকার নোট দিয়ে গাঁথা মালাখানি (যার আর্থিকমূল্য সবমিলিয়ে ৫ কোটি টাকা) শোভা পাচ্ছে, তখন রাহুল গান্ধী ভারতবর্ষের সংবিধান প্রণেতা বি আর আম্বেদকরের জন্মদিবস (১৪ এপ্রিল) পালনের কর্মসূচী তৈরিতে ব্যস্ত। বলা বাহুল্য, মায়াবতীর ঢঙেই সেই কর্মসূচীতে এলাহি আয়োজনের বন্দোবস্ত রয়েছে। আপাতত ঠিক হয়েছে, বি এস পি-র ঘাঁটি আম্বেদকর নগরে একটি সুবিশাল পদযাত্রা আয়োজিত হবে। যে পদযাত্রায় উপস্থিত থাকবেন স্বয়ং রাহুল গান্ধী। এই পদযাত্রার পরে পুরো উত্তরপ্রদেশ জুড়ে আরও বেশ কয়েকটি পদযাত্রার কর্মসূচী নিয়েছে কংগ্রেস। যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনটা কিন্তু সেই আম্বেদকর নগরেই আগামী ১৪ এপ্রিল ডঃ বি আর আম্বেদকরের জন্মদিনকে কেন্দ্র করেই সেরে ফেলতে চাইছেন রাহুল গান্ধী তথা কংগ্রেস নেতৃত্ব।

আসলে সম্প্রতি মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে দলিত ভোটের ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও গাড্ডায় পড়েছে কংগ্রেস। কারণ সংসদে আসন সংখ্যার নিরীখে ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ হলেও তাতে দলিত বা মুসলমান মহিলাদের জন্য আলাদা করে কোনও সংরক্ষণের উল্লেখ নেই। আর এ নিয়েই দলিত কিংবা মুসলিম 'সেন্টিমেন্ট'কে উস্কে দিয়ে সেই ধরনের ভোট-ব্যাঙ্ককে তাঁদের পক্ষে সুসংহত করার একটা মোক্ষম মওকা পেয়ে গিয়েছেন মায়াবতী-মুলায়ম কিংবা মমতা-রা।

কংগ্রেসের অবস্থাটা হয়েছে এখন সাপের ছুঁচো গেলার মতো। না পারছে গিলতে, না পারছে ওগরাতে। মহিলা বিল রাজ্যসভায়

মায়াবতী

রাহুল গান্ধী

পাশ করিয়ে নিয়েছে কংগ্রেস, কিন্তু এনিয়ে তারা সাফল্যের কথা জোর গলায় প্রচার করতেও দ্বিধাগ্রস্ত রয়েছে। দলিতদের সন্তুষ্ট করতে ইতিপূর্বে বহুবার 'গিমিক' প্রদর্শন করেছেন রাহুল কিন্তু এবারেরটা অভিনবত্বে আলাদা। কারণ কংগ্রেস নেতৃত্বের আশঙ্কা হচ্ছে, দলিত সমাজের আইকনে ক্রমশ পরিণত হচ্ছেন মায়াবতী। যেহেতু তোলা আদায় ছাড়াও খেটে খাওয়া মানুষের রক্ত-জল করা টাকাতেই মহা ধূম-ধাম করে জন্মদিন পালিত হয়েছে মায়াবতীর। বর্তমানে মায়াবতী যে পদ্ধতিতে চলছেন তাতে আগামীদিনে তিনি এবং তাঁর গুরু কাঁসিরামকে বাদ দিলে আর কোনও দলিত সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এমনকী বি আর আম্বেদকরের মতো অত বড় মাপের মানুষের ন্যূনতম স্মৃতিচিহ্নটুকুও মুছে গেলে অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না। তবে কংগ্রেসকে উৎসাহিত করেছে সাম্প্রতিক-কালে লক্ষ্ণৌ শহরে মায়াবতীর নেতৃত্বে সংঘটিত দলিত মিছিল। সেই মিছিলে আশ্চর্যজনকভাবে কম উপস্থিতির ফলে চিরকাল দলিতদের পাশে থাকবার কথা বলতে বাধ্য হন 'আবেগপ্রবণ' মায়াবতী। এই জায়গাটা ধরেই এগোতে চাইছে কংগ্রেস-নেতৃত্ব। তারা আম্বেদকরের জন্মদিন পালনের মধ্য দিয়ে উত্তরপ্রদেশের দলিত সমাজকে বার্তা দিতে চাইছে, মায়াবতী বা কাঁসিরাম নয়, আম্বেদকরের বকলমে কংগ্রেসই তাদের ত্রাতা।

২০১২ সালে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনকেই পাখির চোখ করেছে মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টি ও রাহুল গান্ধীর কংগ্রেস। ভোটে দু'পক্ষই মনে করছে 'দলিতবাবা পার করেগা'। তবে প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে, দলিতরা যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই আছেন। এই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকায় ভস্মে ঘি না ঢেলে কি সেগুলো দলিত উন্নয়নের কাজে লাগানো যেত না?

উন্নয়ন অভিমুখী গ্রাম স্বরাজ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গ্রাম স্বরাজ অভিযানের সংজ্ঞাটাই পাল্টে যাচ্ছে ছত্তিশগড়ে। সৌজন্যে সেখানকার সরকারি আধিকারিক এবং কর্মচারীরা। তাঁরা আগামী

রমণ সিং

মাসে ওই রাজ্যের গ্রাম-স্বরাজ অভিযানের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। যে প্রশিক্ষণ তাদের শেখাচ্ছে গ্রাম স্বরাজ অভিযান মানে মামুলী কোনও ব্যাপার নয়, বরং একে বলা যেতে পারে 'উন্নয়নের জন্য আন্দোলন'। আর এই উন্নয়নমুখীতাই ছত্তিশগড়ে গ্রাম-স্বরাজ অভিযানের চিত্রটাকে আমূল বদলে দিয়েছে। এই বদলে দেওয়ার দাবিদার অবশ্যই ছত্তিশগড় সরকার। মুখ্যমন্ত্রী রমণ সিং নিজের হাতে লেখা চিঠিতে জেলা কালেক্টরদের বলেছেন,—"এই কর্মসূচী সরকারি দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও কর্মচারীদের।" খোদ মুখ্যমন্ত্রীর স্বহস্তের চিঠি আসার পরেই উজ্জীবিত হয়ে পড়েন ছত্তিশগড় প্রশাসনের কর্তা-ব্যক্তিরা।

পুরো বিষয়টা ব্যাখ্যা করে রমন বলেছেন, "গ্রাম স্বরাজ অভিযান সংক্রান্ত যে কোনও কর্মসূচীকেই সরকার অগ্রাধিকার দেবে। এর লক্ষ্য থাকবে মানুষের সমস্যাগুলোকে দূর করা, জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সুদৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া এবং গ্রামের মানুষের ন্যূনতম চাহিদাগুলো মেটানো।"

আগামী একমাসে এনিয়ে রমণ সিং-এর পরিকল্পনা হলো সরকারি সাহায্যে চলা প্রকল্পগুলোর কাজ দেখতে মাঝে মধ্যেই অকুস্থলে আচমকা (যেটাকে বলা হয় 'সারপ্রাইজ ভিজিট')-ই পৌঁছে যাবেন তিনি। কাজের তদারকির পাশাপাশি মানুষের সমস্যাগুলোও শুনবেন এবং যথাসাধ্যভাবে ওখানে দাঁড়িয়েই সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করবেন রমণ। যার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে জেলা কালেক্টরদের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিতে রমণ জানিয়েছেন—"জনসংযোগ কর্মসূচীর উদ্দেশ্যই হলো শাসনব্যবস্থাকে আরও দায়িত্বশীল করা এবং জনমুখী করে তোলা।"

জেলা কালেক্টরেরা বলছেন, সরকারি উদ্যোগে উৎসাহিত সরকারি কর্মীরা কাজ চলাকালীন প্রয়োজনে রাত জেগেও গ্রাম পরিদর্শন করবেন। মোটামুটি কুড়ি দফা কর্মসূচীর পরিকল্পনা আপাতত গৃহীত হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প। দৈনন্দিন কাজের ভিত্তিতে সঠিক মজুরীদান, পুকুর তৈরি এবং গ্রামে গ্রামে গাছের চারা-রোপন, গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, স্বাস্থ্য-বীমা চালু করা, বিদ্যুতায়ন, পানীয় জলের সু-বন্দোবস্ত, চাষের জন্য জলসেচন, সামাজিক নিরাপত্তা আইন বলবৎ করা প্রভৃতি এই কর্মসূচীর আওতায় রয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বলতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পেনশন ও অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, এই সবকটি বিষয়ই যাতে সঠিকভাবে দেখভাল করা হয় তার জন্য সরকারি আধিকারিক ও কর্মচারীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

জাল নোটে আচ্ছন্ন ভারতবর্ষের সবকটি রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জাল নোটে ছেয়ে গিয়েছে ভারত। লোকসভায় পেশ হওয়া তথ্য-পরিসংখ্যান থেকে উঠে আসছে এই নির্মম সত্যটাই শুধুমাত্র অনুপ্রবেশ সমস্যা কবলিত পশ্চিমবঙ্গ বা অসমেই নয়, জাল নোট ছড়িয়ে পড়েছে ভারতবর্ষের গোটা তিরিশেক রাজ্যে। এই রাজ্যগুলোর মধ্যে সর্বাগ্রে আসবে পশ্চিমবঙ্গের নাম। এরাজ্যে প্রায় ৭৭টি ঘটনায় ৬৬ লক্ষ ২০ হাজার ৭০০ টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। ঘটনার হিসেবে সবচেয়ে এগিয়ে থাকবে অন্ধ্রপ্রদেশ। সেখানে ২১৬টি জাল নোট চক্রে ৫০ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫০০ টাকা উদ্ধার হয়েছে। এর পরেই রয়েছে পাঞ্জাব। এখানে ৩২টি জাল নোট চক্রে ৪৮ লক্ষ ৬১ হাজার ৪৫০ টাকা উদ্ধার হয়েছে। এর সঙ্গেই বলতে হয় মহারাষ্ট্রের কথা। সেখানে উদ্ধারকৃত জাল নোটের পরিমাণ টাকার অঙ্কে ৩২ লক্ষ ৮১ হাজার ৭৩২ টাকা। এর খুব কাছাকাছিই রয়েছে উত্তরপ্রদেশ। সেখানে ৩২ লক্ষ ২৪ হাজার ৮৭০ টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। তবে জাল নোট চক্রের হিসেবে মহারাষ্ট্র অনেক এগিয়ে, এমনকী পাঞ্জাবের থেকেও। প্রায় ১৮০টি ঘটনায় উদ্ধার করা হয়েছে মহারাষ্ট্রের জাল নোটগুলোকে। উত্তরপ্রদেশে এইরকম জাল নোট-চক্রের হদিশ মিলেছে প্রায় অর্ধেক, ৯১। তবে তামিলনাড়ুতে আবার এইধরনের ঘটনা বেশ বেশি, ১৩৯টি। কিন্তু উদ্ধার হওয়া জাল নোটের ভিত্তিতে টাকার পরিমাণটা উপরিউক্ত রাজ্যগুলোর তুলনায় বেশ কম, ৩২ লক্ষ ২৪ হাজার ৮৭০ টাকা। অন্যদিকে আসামে ৩৯টি ঘটনায় এখনও অবধি ২০ লক্ষ ৫১ হাজার ২৫০ টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। ১০৯টি ঘটনায়

গুজরাতে উদ্ধার হওয়া জাল নোটের পরিমাণ ১২ লক্ষ ১১ হাজার ২৫০ টাকা। অন্যদিকে ২৭টি ঘটনায় ছত্তিশগড়ে ৯ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫০০ টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। ১৫টি ঘটনার ভিত্তিতে জম্মু-কাশ্মীরে উদ্ধার হওয়া জাল নোটের পরিমাণ ৯ লক্ষ ২৩ হাজার ৬০০ টাকা। ২৩টি ঘটনায় গোয়াতে ৮ লক্ষ ৬০ হাজার ৫৫০ টাকার জল নোট উদ্ধার হয়েছে। ২৯টি ঘটনায় কেরলে ৭ লক্ষ ৩ হাজার টাকার জালনোট পাওয়া গেছে। এছাড়াও মিজোরামে ১১টি মামলায় ৬ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। ত্রিপুরাতেও ১১টি ঘটনায় ৬ লক্ষ ২৮ হাজার ৫০০ টাকার জাল নোট মিলেছে, মধ্যপ্রদেশে ১৪টি ঘটনায় ৫ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। কর্ণাটকে ৩৯টি ঘটনায় ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ১১০ টাকার নোট উদ্ধার হয়েছে। একইভাবে হরিয়ানা, দিল্লী, নাগাল্যান্ড, উত্তরাখণ্ড, রাজস্থান, অরুণাচল প্রদেশ, বিহার, হিমাচল প্রদেশ ও অন্যান্য রাজ্যেও প্রচুর জাল নোট উদ্ধার হয়েছে।

কাশ্মীরে ৩২ হাজার বিধবা ও ৯৭ হাজার অনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর উপত্যকা ক্রমশই নরকে পরিণত হচ্ছে। সাধারণ মানুষ হিংসা ও সন্ত্রাসের আবহে জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। নিরীহ মানুষ যেভাবে হিংসা এবং সন্ত্রাসের বলি হচ্ছে তা এককথায় অকল্পনীয়। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে কাশ্মীর উপত্যকার ৩২০০ বিধবা (যাদের বেশির ভাগই বয়সে কম) এবং ৯৭০০০ অনাথ শিশুর চোখের জল মোছাবার জন্য কেউই নেই। উপত্যকার প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী বসির আহমদ ডবলার-এর বক্তব্য, ওই সংখ্যাটা প্রতিদিনই বাড়ছে। বিচ্ছিন্নতাবাদের কামড় পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলছে। ওই হতভাগ্য অনাথ ও বিধবাদের সম্মানের সঙ্গে পুনর্বাসনের জন্য কোনও সরকারি বা বেসরকারি প্রয়াস চোখে পড়ছে না। সাধারণ মানুষ জীবন হাতের মুঠোয় নিয়ে ঘর থেকে বের হচ্ছে বাধ্য হয়ে। কেউ জানে না কখন কোন্ গলিতে জীবনে অন্ধকার নেমে আসবে।

বাংলা সন ও তার ঐতিহ্য প্রসঙ্গ

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ গণনা পদ্ধতি অনুসারে পৃথিবীতে প্রধানত তিনশ্রেণীর সন দেখতে পাওয়া যায়—চান্দ্রসন, সৌরসন ও না(ত্রসন।

'সন' শব্দটি আরবী শব্দ। অর্থ বর্ষ। বাংলা সন মানে বাংলা বৎসরের দিন, (ণ ইত্যাদির তালিকা। 'সাল' অর্থাৎ বৎসর। শব্দটি ফরাসী। 'তারিখ' মানে দিন। শব্দটি আরবী।

বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজা ও রাজবংশের কল্যাণে বিভিন্ন রকমের সনের প্রচলন ছিল। এদেশের প্রাচীন সনের মধ্যে বিত্র(ম সম্বৎ (৫৮ খৃষ্ট পূর্বাব্দ) শকাব্দ (৭৮ খৃষ্ট পূর্বাব্দ)-এর প্রচলন ব্যাপক ছিল। সেন রাজবংশের সর্বশেষ রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকাল থেকে লক্ষ্মণাব্দ সনের প্রচলন হয়। আইন ই আকবরী (আকবরনামা) পাঠ্যে জানা যায় সম্রাট আকবরের নবতর সন প্রতিষ্ঠাকালে ৪৬৫ লক্ষ্মণাব্দ প্রচলিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গের বিষু(পুরস্থিত প্রচলিত সনকে মল্লাব্দ বা বিষু(পুরীসন বলা হয়। শোনা যায় এই রাজবংশের আদিপু(ষ আদিমল্লের নামে এই সনের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। প্রতিষ্ঠাকাল ৬৯৬ খৃষ্টাব্দ। কেউ কেউ মনে করেন আদিমল্লই এই সনের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু আদিমল্লের সিংহাসনের আরোহনের কাল ১০২ মল্লাব্দ। মল্লাব্দের সঙ্গে ৬৯৬ যোগ করলে খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। ত্রিপুরার রাজাধিরাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সনের নাম ত্রিপুরাব্দ। প্রতিষ্ঠা সন ৫৯০ খৃষ্টাব্দ। তাই এই ত্রিপুরাব্দের সঙ্গে ৫৯০ যোগ করলে খৃস্টাব্দ মেলে। এছাড়া চৈতন্যদেবের জন্মসাল থেকে চৈতন্যাব্দ বা বৈষ(ব সনও চালু হয়। ইতিমধ্যে এদেশে যে তিনটি মুখ্যসন গণনা যেভাবে হয় তা হলো—

চান্দ্রসন—চন্দ্রের বর্ষ পরিত্র(মার হিসাব অনুযায়ী এই সন প্রতিষ্ঠিত। চন্দ্রের বর্ষ পরিত্র(মার হিসেবে ২৯½ দিনে চান্দ্র মাসের হিসেবে চান্দ্রবর্ষ হয় ৩৫৪ দিন ৯ ঘণ্টায়। বিত্র(মসম্বৎ এই শ্রেণীর সন।

সৌরসন — সূর্যের বার্ষিক গতি অনুসারে সৌরবর্ষ হয় ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায়। ভারতীয় শকাব্দ এই শ্রেণীর সন।

রাশিচক্রের অনুক্রমে সৌরমাস বিভাগ, ভোগকাল ও নক্ষত্রে প্রবেশ ঃ

রাশির নাম	পরিক্রমণ কাল	মাস	সৌর দিন	নক্ষত্র
মেষ	,,	বৈশাখ	৩১	বিশাখা
বৃষ	,,	জ্যৈষ্ঠ	৩১½	জ্যৈষ্ঠা
মিথুন	,,	আষাঢ়	৩১½	আষাঢ়া
কর্কট	,,	শ্রাবণ	৩১½	শ্রবণা
সিংহ	,,	ভাদ্র	৩১½	ভাদ্রপদ
কন্যা	,,	আশ্বিন	৩০½	অশ্বিনী
তুলা	,,	কার্তিক	৩০	কৃত্তিকা
বৃশ্চিক	,,	অগ্রহায়ণ মার্গশীর্ষ	২৯½	মৃগ-শিরা
ধনু	,,	পৌষ	২৯	পুষ্যা
মকর	,,	মাঘ	২৯	মঘা
কুম্ভ	,,	ফাল্গুন	৩০	ফাল্গুনী
মীন	,,	চৈত্র	৩১½	চিত্রা

না(ত্রসন— রাশিচত্র(র ভিতর দিয়ে চন্দ্রের সাতাশটি ন(ত্র পরিত্র(মণের হিসেবে না(ত্রসনের প্রতিষ্ঠা। জ্যোতিষশাস্ত্রে ন(ত্র বলতে কিন্তু সাধারণ তারা বোঝায় না, কয়েকটি তারার সমন্বয়ে এক একটি ন(ত্রমণ্ডল। চন্দ্রের ন(ত্রমণ্ডল পরিত্র(মা সমাপ্ত হয় মোট ২৯½ দিনে। এই সাড়ে উনত্রিশ দিনে ত্রিশটি তিথি বা চান্দ্রদিন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। না(ত্রসনে এই ত্রিশদিনে মাস ধরলে 30×12=360 দিনে এক বৎসর হয়। উল্লেখ্য যেখানে চন্দ্রের রাশি পরিত্র(মণে সময় লাগে ত্রিশ দিন, প(ান্তরে সেখানে সূর্যের লাগে ৩৬৫ দিন অর্থাৎ এক মাসে সূর্য মাত্র একটি করে রাশি অতিত্র(ম করে। তাই চন্দ্রের পরিত্র(মণের সময়কে বলে মাস আর সূর্যের পরিত্র(মণের সময়কে বলে বৎসর। আমাদের প্রাচীন পূর্বপু(ষেরা মাস বলতে বুঝতেন চাঁদের এক পূর্ণিমা থেকে আর এক পূর্ণিমায় আসতে যে সময়টা লাগত সেই সময়টাকে। সাধারণত সাড়ে উনত্রিশ দিন সময় লাগে। তাই সাড়ে উনত্রিশ দিনে এক মাস নির্ধারিত হলো। এই মাস চান্দ্রমাস নামে খ্যাত। এতে দিনের সংখ্যা দাঁড়াল ৩৫৪ দিন বা ৩৫৫ দিন। এরপরে সূর্যের গতিবিধি দেখে সময় ভাগ করার ফলে সৌরমাস বা সৌরবৎসরের সৃষ্টি হলো। এক সংত্র(ান্তি থেকে আর সংত্র(ান্তি পর্যন্ত সময়কে এক সৌরমাস বলা হয়। সূর্যের এক রাশি থেকে পরবর্তী রাশিতে প্রবেশ করাকে সংত্র(ান্তি বলে। সূর্য রাশিচত্র(বা ত্র(ান্তিবৃত্তের উপর দিয়ে চলতে চলতে যেদিন মেষ রাশিতে প্রবেশ করে সেদিন থেকে আমাদের নতুন বৎসর আরম্ভ হয়।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে চার প্রকার মাসের নাম করা হয়েছে। যেমন—কৃষ(প(র অন্তিম তিথি অর্থাৎ অমাবস্যাতে চন্দ্র-সূর্যের সঙ্গে সন্নিকৃষ্ট হয়। চন্দ্র-সূর্যের এরূপ এক সন্নিকর্ষ হতে যে পর্যন্ত তমাবিধ অপর সন্নিকর্ষ না হয়, সেই

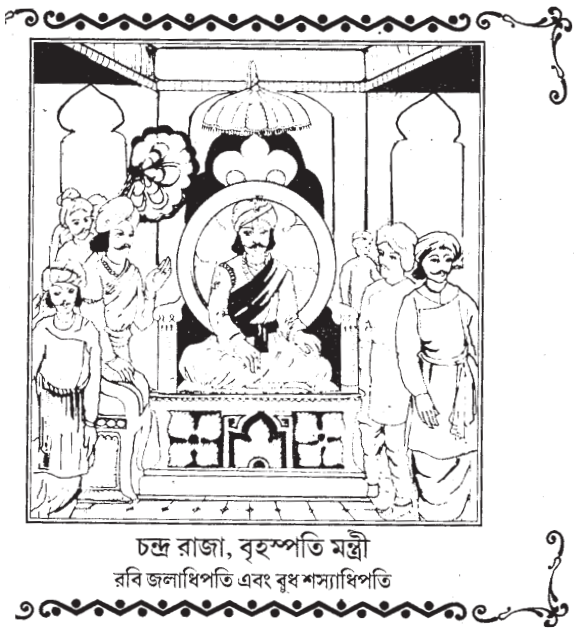

চন্দ্র রাজা, বৃহস্পতি মন্ত্রী
রবি জলাধিপতি এবং বুধ শস্যাধিপতি

কালকে চান্দ্রমাস বলে। এক সূর্যোদয় হতে আবার সূর্যোদয় পর্যন্ত কালকে একটি সাবন দিন বলা হয়। এরূপ ৩০টি সাবন দিনে একসাবন মাস হয়। সূর্যের এক একটি রাশির ভোগকালকে সৌরমাস মাসে অভিহিত করা হয়। এবং চন্দ্রের ২৭টি ন(ত্র ভোগ শেষ হলে এক একটি না(ত্র মাস হয়। অর্থাৎ চান্দ্রমাস, সৌরমাস, আর সাবন মাস ও না(ত্র মাস সাধারণ মাসের হিসাব ৩০ দিনে ধরতে হবে।

রাশি— বারোটা রাশির নাম হলো, মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। চাঁদ সাতাশদিনে বারো রাশি ও সাতাশ ন(ত্রে একবার করে ঘুরে আসে। সূর্যের সেই রাশিচত্রে(র উপর দিয়ে একবার ঘুরে আসতে লাগে এক বৎসর। ল(্য করার বিষয়, মাসের নামকরণের সঙ্গে এই রাশিচত্রে(র ন(ত্রদের নাম জড়িত রয়েছে। কেননা পূর্ণিমার চাঁদ রাশিচত্রে(র সেই ন(ত্রের উপর দাঁড়িয়ে পূর্ণিমা দেখায় তার নাম অনুসারে মাসের নামকরণ করা হয়। যেমন আমরা বৈশাখ সেই মাসকেই বলি যে মাসে চাঁদ রাশিচত্রে(র বিশাখা ন(ত্রের উপর দাঁড়িয়ে পূর্ণিমা দেখায়। শাস্ত্রমতে অগ্রহায়ণকে মার্গশীর্ষমাস বলে অভিহিত করা হয়েছে।

রাশিচত্র(ও ন(ত্র— সমগ্র রাশিচত্র(কে সাতাশটি সমান ভাগে ভাগ করলে যে বৃত্তাংশ হয় তাই জ্যোতিষশাস্ত্রে ন(ত্র নামে অভিহিত। বারোটি রাশি নিয়ে যে রাশিচত্র(হয় তার মধ্যে সাতাশটি ন(ত্র অবস্থান করে। এবং প্রত্যেকটি ন(ত্রের ভাগে পড়ে ২⅓ টি ন(ত্র। অর্থাৎ বারো রাশি ও সাতাশ ন(ত্র মিলে রাশিচত্র(পূর্ণ হয়। পুরাণে এই সাতাশটি ন(ত্র সম্পর্কে একটি সুন্দর গল্প রয়েছে। গল্পটি হল ঃ দ(প্রজাপতির সাতাশটি পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। এই সাতাশটি কন্যার নাম যথাত্র(মে—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আদ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অ(্যা, মঘা, পূর্বফাল্গুনী, উত্তর ফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বষাঢ়া, উত্তরষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ, উত্তর ভাদ্রপদ এবং রেবতী।

দ(রাজা মেয়েদের বিয়ের জন্য উপযুক্ত(বরের সন্ধান করে একমাত্র চন্দ্রদেব ছাড়া অন্য বরের সন্ধান পেলেন না। তাই অনন্যোপায় হয়ে চন্দ্রদেবের সঙ্গেই তাঁর সাতাশ কন্যার বিয়ে দিলেন। ফলে চন্দ্রদেব পড়লেন মহামুশকিলে। একা একজন স্বামী এই সাতাশ স্ত্রীর ঘর সামলাবেন কেমন করে? মাথায় তাঁর বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি স্থির করলেন, বারো রাশিচত্রে(র মধ্যে তিনি তাঁর সাতাশ সুন্দরী স্ত্রীকে এমনভাবে ঘর বেঁধে দেবেন যাতে প্রতি মাসে এক একবার করে অন্তত তাঁদের প্রত্যেককে সা(াৎ দিতে আসতে পারেন। সেই ব্যবস্থা মতো চাঁদ স্বামী নাকি আজও রাশিচত্র(পাড়ি দিয়ে তাঁর প্রিয়তমা পত্নী—অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকাদের মাসে অন্তত একবার করে দেখা দিয়ে এসে তিন দিন বিশ্রাম করেন। চাঁদের এই রাশি পরিত্র(মণকেই আমরা 'মাস' বলি।

তিথি— চান্দ্র দিনকে তিথি বলা হয়। এক চন্দ্রমাসে তিরিশটি তিথি থাকে। একটি চান্দ্রমাসের পরিসর হল ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট ২⅘ সেকেন্ড বা ২৯.৫৩০৫৮৮৩। অমাবস্যা, প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী ও চতুর্দশী এই পনেরো তিথি নিয়ে শুক্লপ(। শুক্লপ(র পরেই দেখা দেয় পূর্ণিমা। পূর্ণিমাসহ উপরিউক্ত(চৌদ্দটি তিথি নিয়ে হয় কৃষ(প(র তিথি। আপন ক(পথে চন্দ্র যেদিন সূর্য আর পৃথিবীর মাঝখানে আসে, সেদিন নিজস্ব আলোকহীন চন্দ্রের সূর্যালোকে আলোকিত অর্ধাংশ পৃথিবীর বিপরীত দিকে থাকায় চন্দ্রকে দেখা যায় না, এই দিনকেই অমাবস্যা বলে। আপন ক(পথে পৃথিবী যেদিন চন্দ্র আর সূর্যের মাঝখানে থাকে সেদিন চন্দ্রের আলোকিত অংশের সমস্তটাই দেখা যায়। ওইদিন থেকেই পূর্ণিমার আরম্ভ।

মাস	দিন	সাধারণ বৎসর	অধিবর্ষ
বৈশাখ থেকে ভাদ্র	৩১×৫=	১৫৫	১৫৫
আশ্বিন থেকে ফাল্গুন	৩০×৬=	১৮০	১৮০
চৈত্র	৩০=	৩০	৩১
	মোট =	৩৬৫	৩৬৬

পূর্ণিমার আরম্ভ থেকে পরবর্তী অমাবস্যা এবং ওই অমাবস্যা থেকে পরবর্তী পূর্ণিমার প্রারম্ভ পর্যন্ত চন্দ্রকলার যে হ্রাসবৃদ্ধি হয়, তারই এক একটি পর্যায় হলো এক একটি তিথি। এক অমাবস্যা থেকে পরবর্তী অমাবস্যা ও এক পূর্ণিমা থেকে পরবর্তী পূর্ণিমা পর্যন্ত সময়কে যথাত্র(মে মুখ্যচান্দ্রমাস ও গৌণ চান্দ্রমাস বলে। দিন ও দণ্ড— আমাদের সৌরদিন ২৪ ঘণ্টায় সমাপ্ত হয়। একদিনকে ৬০টি সমান ভাগে ভাগ করলে হয় দণ্ড। এক হিসেবে এক দণ্ড অর্থাৎ ২৪ মিনিট।

দেশীয়কাল পরিমাণ

৬০ অনুপল	১ বিপল	০.৪ সেকেন্ড
৬০ বিপল	১ পল	২৪ সেকেন্ড
৬০ পল	১ দণ্ড	২৪ মিনিট
৭.৫ দণ্ড	১ প্রহর	৩ ঘণ্টা
৮ প্রহর	১ দিন	২৪ ঘণ্টা

বারবেলা ও কালবেলা ঃ দিনমানকে আটভাগে ভাগ করলে ওই এক এক ভাগকে দিবাযামার্ধ বলে। রবিবারে চতুর্থ ও পঞ্চম, সোমে সপ্তম ও দ্বিতীয়, মঙ্গলে দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ, বুধে পঞ্চম ও তৃতীয়, বৃহস্পতিতে সপ্তম ও অষ্টম, শুত্রে(তৃতীয় ও চতুর্থ, শনিবারে ষষ্ঠ ও অষ্টম এবং প্রথম মাসার্ধ যথাত্র(মে বারবেলা ও কালবেলা হয়।

কালরাত্রি ঃ রাত্রিমানের আটভাগের এক এক ভাগকে রাত্রিযামার্ধ বলে। রবিবারে রাত্রির ষষ্ঠ যামার্ধ, সোমে চতুর্থ, মঙ্গল দ্বিতীয়, বুধে সপ্তম, বৃহস্পতিতে পঞ্চম, শুত্রে(তৃতীয়, শনিবারে প্রথম ও অষ্টমযামার্ধ কালরাত্রি।

বাংলামাসের দিনসংখ্যা নির্ধারণের ে(ত্রে সঠিক বিভাগ কোনও নির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। তবে জ্যোতিষশাস্ত্রে রাশিচত্রে(র অনুত্র(মে সৌরমাসের ভোগকাল ও ন(ত্রের প্রবেশ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলাদেশে মাস বৎসর ও দিনের হিসাব মূলক একটি ছড়া প্রচলিত রয়েছে।

একুত্রিশে বৈশাখ মাসে বৎসরের শু(
এইমত ভাদ্র একে বলে আর্য্যগু(
আশ্বিন কার্তিক মাস ত্রিংশতি ধরিবে
এইভাবে চৈত্র এক মিলন করিবে
সেই চৈত্র মাস তাই একুত্রিশে হবে
চার দিয়ে ভাগে যার অব্দ মিলে যাবে।

এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে বাংলামাস গণনার সুবিধার জন্য বৈশাখ থেকে ভাদ্র পর্যন্ত পাঁচ মাসের প্রতিমাস ৩১ দিন হিসেবে এবং আশ্বিন থেকে চৈত্র পর্যন্ত বাকী সাত মাসের প্রতিমাস ৩০ দিন হিসেবে গণনা করা হবে। অধিবর্ষের (লিপইয়ার) চৈত্রমাস ৩১ দিনে হবে। ৪ দ্বারা সে সাল বিভাজ্য, তাই অধিবর্ষ বলে পরিগণিত হবে।

বর্তমানে আমাদের দেশে দু'ধরণের পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে—দৃক্‌সিদ্ধ ও অদৃক্‌সিদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গে বহুল প্রচলিত পঞ্জিকা গুপ্তপ্রেস ও পিএম বাগচী, পূর্ণচন্দ্র প্রভৃতি হলো অদৃক্‌সিদ্ধ এবং ভারত সরকারের রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ আর বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা হল দৃক্‌সিদ্ধ। এখন এই দৃক্‌সিদ্ধ ও অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকাগুলির মতভেদ ও মতান্তর নিয়ে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত।

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা গণনাপদ্ধতি হয়ে থাকে সর্বাধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূত্রাবলির ভিত্তিতে এবং ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের সাহায্যে। এর ফলে এইরকম পঞ্জিকায় লিপিবদ্ধ চন্দ্র ও গ্রহের অবস্থানের সঙ্গে রাতের আকাশে দূরবীণ দিয়ে দৃশ্যমান চন্দ্র ও গ্রহের অবস্থানের কোনওরকম পার্থক্য থাকে না। তিথি ও নক্ষত্রের সময়ও গণনা করা হয়ে থাকে একেবারে নির্ভুল সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থান থেকে। আর প্রাচীন পন্থী পঞ্জিকাকাররা তাঁদের গণনার জন্য সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থের ওপর নির্ভর করে থাকেন। ওই গ্রন্থ

বাংলা পঞ্জি

**আনুমানিক ৪০০ খৃস্টাব্দে ভার
দূরবীণ যন্ত্র আবিষ্কার হয়নি এবং
কিছু গড়ে ওঠেনি। মাপজোকে
খালিচোখে দেখে এমন সব গণন
আমাদের দেশে করতেন যা
পৃথিবীর জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহ
একটি মহামূল্য গ্রন্থ বলে চিরকা
বর্তমানে জ্যোতির্বিজ্ঞান অত্যন্ত
সূত্রাবলির সংস্কার অত্যন্ত প্রয়োজ
সূর্যসিদ্ধান্ত রচিত হয়েছিল সেইস
সাহায্যে গ্রহের অবস্থান গণনা
বিশেষজ্ঞদের মতে কিন্তু আজকে
গণনা করে যে তথ্য পাওয়া যায়**

বাংলা পঞ্জিকার উৎস ও পরম্পরা

নবকুমার ভট্টাচার্য।। পঞ্জিকা শব্দটি সংস্কৃত শব্দ। যাতে মাস, তিথি, বার, নক্ষত্র প্রভৃতি জানা যায় তাই পঞ্জিকা। ব্যাখ্যাকার হেমচন্দ্র পঞ্জিকা শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন—'টীকা নিরন্তর ব্যাখ্যা পঞ্জিকা পদভঞ্জিকা' অর্থাৎ যাতে নিরন্তর ব্যাখ্যা রয়েছে তার নাম টীকা এবং যাতে নিরন্তর পদভঞ্জন রয়েছে তার নাম পঞ্জিকা। বৎসরের প্রথমে গ্রহাচার্যের কাছে পঞ্জিকা শুনতে হয়। যা শুনলে অশুভ বিদূরিত হয়। বর্ষারম্ভে শিব যেমন পার্বতীকে বৎসরের ফলাফল অবশ্যকর্তব্য হিসেবে শুনিয়ে থাকেন, তেমনি সুপ্রাচীনকালে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণরা সেই কাজটি সাধারণ মানুষের জন্য করে থাকতেন। ভক্তিভরে নতুন পঞ্জিকা শুনলে সব তীর্থ দর্শনের ফললাভ হয় এবং জীবনের সকল অশুভ দূর হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

বারো হরতি দুঃস্বপ্নং নক্ষত্রং পাপনাশনং
তিথির্ভবতি গঙ্গায়া যোগঃ সাগরসঙ্গমঃ
কারণং সর্বতীর্থানি শ্রূয়ন্তে দিন পঞ্জিকাঃ।

দিন পঞ্জিকা শুনলে বারোফলে দুঃস্বপ্ন নাশ, নক্ষত্রে পাপনাশ, তিথিতে গঙ্গাতুল্য ফল, যোগে সাগরসঙ্গম সদৃশ ও করণে সকল তীর্থ ফল হয়। জ্যোতিষতত্ত্বম্ গ্রন্থের বরাহ বচনে লেখা রয়েছে—বার ও নক্ষত্র এরা দুঃস্বপ্ন এবং পাপনাশক, তিথি আয়ুষ্করী, যোগ বুদ্ধি বর্দ্ধক, চন্দ্র সৌভাগ্যপ্রদ ইত্যাদি। আমাদের রাজ্যে যাকে পঞ্জিকা বলা হয় বাংলার বাইরে তা পঞ্চ াঙ্গ নামে প্রচলিত। বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও কারণ—এই পাঁচটি বিষয় নিয়ে পঞ্জিকায় আলোচনা থাকে বলে একে বলা হয় পঞ্চ াঙ্গ। তবে বাংলা পঞ্জিকায় আরও বহু বিষয় স্থান পেয়েছে।

আমাদের দেশে বেদের কালে কোনও না কোনও রকম গণনার প্রচলন ছিল। যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত সময় নির্দ্ধারণ, দূর পথে যাত্রা প্রভৃতি নানা প্রয়োজনে গ্রহ নক্ষত্রের মতিগতি নির্ণয় করার জন্য সময় জানা প্রয়োজন হোত। বৈদিক ঋষিরা বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন, সেজন্য ঋতু বিভাগের প্রয়োজন ছিল। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা সায়ন ও ঋতুনিষ্ঠ বৎসর গণনা করতেন এবং বৎসরকে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। রবির উত্তর এবং দক্ষিণগতি পর্যবেক্ষণ করেই অয়ন বিভাগ করা হত। তাঁরা বৎসরকে তপঃ, তপস্যা, মধু, মাধব, শুক্র, শুচি, নভস্, নভস্যইব, উর্জ, সহস্, সাহস্র ও সহস্য এই বারটি মাসে ভাগ করেছিলেন। তপঃ হতে শুচি পর্যন্ত উত্তরায়ণের অন্তর্গত এবং নভস্ হতে সহস্য পর্যন্ত দক্ষিণায়নের অন্তর্গত। এই প্রকার কালবিভাগ যজুর্বেদের কালে রচিত হয়েছিল। তখন তিথির ব্যবহার ছিল না। মাত্র পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও অষ্টকা ব্যবহৃত হত। বৈদিক ঋষিরা অমাবস্যাকে অগ্নিস্থাপনের প্রশস্ত সময় মনে করতেন। নক্ষত্র বিভাগ ছিল। কৃত্তিকা নক্ষত্র হতে গণনা করে ২৭টি বা ২৮টি নক্ষত্রে 'ভ' চক্র বিভক্ত করা হত। সেকালে চান্দ্রমাস গণনার উল্লেখ রয়েছে। পূর্ণিমা, ফাল্গুনী প্রভৃতির উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়, মনে হয় তৎকালে যে চান্দ্রমাস প্রচলিত ছিল তা পূর্ণিমান্ত মাস।

পরবর্তী বেদাঙ্গ জ্যোতিষকালে অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পঞ্জিকা গণনা প্রবর্তিত হয়। এই পঞ্জিকার বৎসর আরম্ভ হোত উত্তরায়ণ থেকে এবং ১২টি চান্দ্রমাস এতে ব্যবহৃত হোত। ৩০টি তিথি এবং ২৭টি নক্ষত্র ব্যবস্থা ছিল আর পাঁচ বৎসরের একযুগের পর এই পঞ্জিকার গণনা আবর্তিত হোত। তখনও সূক্ষ্মাতিথ্যন্ত প্রভৃতি কাল গণনার আবিষ্কার হয়নি, মধ্যমমানে প্রতিদিন একতিথি এক নক্ষত্র একহিসাবে তিথ্যাদি নিরূপিত হোত। এবং মধ্যে মধ্যে এক একটি তিথি হিসেব থেকে বাদ দেওয়া হতো। পঞ্চ বর্ষাত্মক যুগব্যতীত কোনও অব্দগণনার প্রথা তখনও প্রবর্তিত হয়নি। এই বেদাঙ্গ জ্যোতিষ পঞ্জিকার সাহায্যে বহুকাল ভারতের কালগণনা ও যজ্ঞাদির কালনির্ণয় সাধিত হয়েছিল। মহাভারতের পঞ্চ পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময়পূর্তির হিসাব করবার সময়ও এই বেদাঙ্গ জ্যোতিষ পঞ্জিকার গণনা পদ্ধতিই গ্রহণ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ক্রমে ক্রমে দেশে সূক্ষ্ম গণনা পদ্ধতির অভ্যুদয় হয়। আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির প্রমুখ জ্যোতির্বিদ এই পদ্ধতিকে জ্যোতির্বিদ্যার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। এবং তিথ্যাদি সূক্ষ্মকাল গণনার সূত্রাদির সাহায্যে প্রতিদিনের তিথি নক্ষত্র প্রভৃতির স্থিতিকাল পূর্তিকাল পঞ্জিকামধ্যে সন্নিবেশের ব্যবস্থা করেন। আরও পরে 'সূর্যসিদ্ধান্ত' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ সংকলিত হয়। এই সূর্যসিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই এদেশে পঞ্জিকা গণনা হয়ে থাকে। দেশের বিভিন্ন স্থানে জ্যোতিষীরা সূর্যসিদ্ধান্তের পদ্ধতিতে গণনা করে বার তিথি নক্ষত্র যোগ ও করণ যুক্ত প্রতিদিনের পঞ্চ াঙ্গ তালপাতায় লিপিবদ্ধ করে বৎসর আরম্ভের পূর্বে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে শুনিয়ে আসতেন। যার দ্বারা গ্রামের ধর্মকৃত্যসাধনের কাল নির্ণয় হোত।

বাংলাদেশে পঞ্জিকা গণনার ইতিহাস বহু প্রাচীন। মুদ্রিত পঞ্জিকার বয়স মোটামুটি দু'শ বছর। সূর্যসিদ্ধান্ত অনুসারে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষ দশকে রচিত রাঘবানন্দের স্মারণী গ্রন্থই বাংলা পঞ্জিকার মূল উপাদান। যতদূর জানা যায় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত 'রামহরি পঞ্জিকা' হলো বঙ্গ দেশের প্রথম মুদ্রিত পঞ্জিকা। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৫৩। এই পঞ্জিকায় একটিমাত্র ছবি ছিল, যাতে দেখান হয়েছে এক দেবী সূর্যের রথ টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। এই একই সময়ে কলকাতার জোড়াসাঁকো থেকে দুর্গাপ্রসাদ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় কয়েকখানি পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

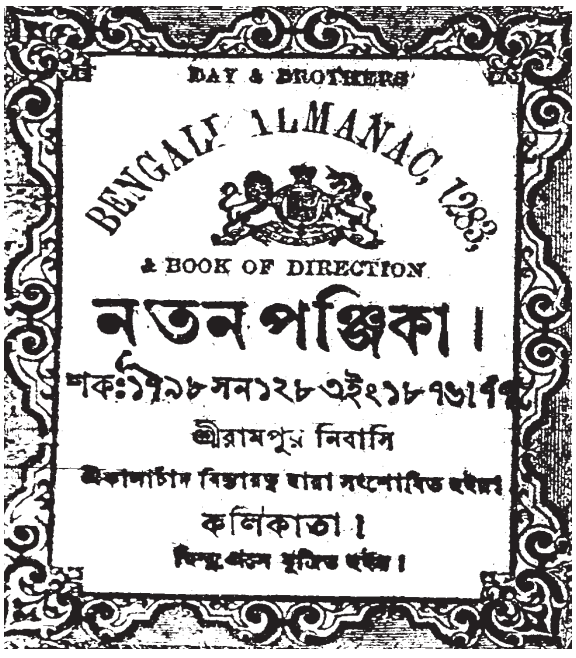

রেভারেণ্ড লঙ্ এর তালিকার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ১৮০৬ খষ্টাব্দের একটি পঞ্জিকার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সে সম্পর্কে বিস্তারিত কোনও তথ্য দেননি। হাতে লেখা পঞ্জিকা অবশ্য চালু ছিল অনেক আগে থেকেই। ১৭২২ সালে প্রকাশিত হাতে লেখা পুঁথির সংবাদ জেমস লঙ্ এর প্রতিবেদন থেকে পাওয়া যায়। ১৮০৭ সালে প্রকাশিত হাতে লেখা পঞ্জিকার সংবাদ উইলিয়াম ওয়ার্ডের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়। এ সম্বন্ধে 'নবদ্বীপ পঞ্জিকা'র নাম জানতে পারা যায়। মনে করা হয় স্মার্ত রঘুনন্দন প্রথম এই পঞ্জিকার গণনা আরম্ভ করেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে রামরুদ্র বিদ্যানিধি এই পঞ্জিকার গণনাকার্য সম্পাদনা করতেন। অল্পকাল পরে নবদ্বীপ পঞ্জিকা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী ইংরেজ আমলে বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব পঞ্জিকার গণনাকার্য চালিয়ে যান। এই পঞ্জিকা ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয় এবং বর্তমানে যা 'গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা' নামে প্রচলিত। 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'র এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে, ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের মাত্র কয়েক বছর আগে মুদ্রিত পঞ্জিকার প্রচলন আরম্ভ হয়। নদীয়ার অগ্রদ্বীপের নিকটবর্তী একটি গ্রামে গঙ্গাধর নামে জনৈক ব্যক্তি একটি পঞ্জিকা ছাপিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। গ্রামাঞ্চলে পঞ্জিকা মুদ্রণের কথা এই প্রথম জানা যায়। ১৮২৫ সালে কলকাতা থেকে বিশ্বনাথ তর্কভূষণের সম্পাদনায় একখানি পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়, যা কলেজ পঞ্জিকা নামে খ্যাত ছিল। শ্রীরামপুর থেকে আরও অনেক পঞ্জিকা উনিশ শতকে প্রকাশিত হয়েছিল। তারমধ্যে ১৮২৫, ১৮৪২ ও ১৮৫৩ সালে চন্দ্রোদয় প্রেস এবং ১৮৯৬ সালে গাঙ্গুলী প্রেস থেকে প্রকাশিত পঞ্জিকা উল্লেখযোগ্য।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথায়' ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের সংবাদে দেখা যাচ্ছে, ''এতদ্দেশে নবদ্বীপ, মৌলা, বারইখালি, বাকলা, খানাকুল, বজরাপুর, বালি ও গণপুর এই সকল গ্রামে পঞ্জিকা প্রস্তুত হয়।' লঙ্ সাহেব আরও কয়েকটি স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন সেখানকার পুঁথি পঞ্জিকা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জনাই বকসা, কৃষ্ণনগর, কোদালিয়া, দিগ্‌সা ও বিষ্ণুপুর।

পঞ্জিকাপ্রসঙ্গে পণ্ডিতদের সঙ্কলিত পঞ্জিকায় স্বাভাবিকভাবেই কিছু কিছু পার্থক্য দেখা দিত। ইংরেজরা এদেশের শাসনভার গ্রহণ করে দেশীয় তারিখ অনুযায়ী নানাবিধ অনুষ্ঠান ও রাজকার্য নির্বাহ করত। কিন্তু বিভিন্ন লোকের দ্বারা সঙ্কলিত হাতে লেখা পঞ্জিকায় প্রায়ই তারিখ বার ইত্যাদির রকমফের দেখা দেওয়ায় রাজকার্য বিঘ্নিত হোত। তাই সরকারের অনুরোধে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বিশিষ্ট পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করে এক আলোচনা সভায় পঞ্জিকা সংকলনের একটি সর্বসম্মত বিধি স্থির করেন। কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যানিধিকে দিয়ে পঞ্জিকা সংকলন করিয়ে স্থানীয় নবাব, বিশিষ্ট পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তিদের বিতরণ করতেন। এইসব কারণেই বাংলা পঞ্জিকার প্রথম পৃষ্ঠপোষক তাঁকেই বলা হয়। তাই প্রথম দিকে আমরা প্রায় সকল মুদ্রিত পঞ্জিকায় দেখতে পাই সঙ্কলকরা নামপত্রে লেখেন—'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুমত্যানুসারে' বা 'নবদ্বীপাধিপতির অনুমত্যানুসারে' সঙ্কলিত। স্বাধীনভারতে এই সমস্যার সমাধান কল্পে ভারত সরকার ১৯৫২ সালে মেঘনাদ সাহাকে সভাপতি করে একটি পঞ্জিকা সংস্কার কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি ১৯৫৫ সালে সর্বাধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতিতে পঞ্জিকার সমস্ত তথ্যাদি গণনার সুপারিশ করেন। ভারত সরকার এই সুপারিশ গ্রহণ করে ইংরেজি বাংলা ও আরও ১০টি ভারতীয় ভাষায় প্রতি বছর রাষ্ট্রীয় পঞ্চ াঙ্গ প্রকাশনার ব্যবস্থা করেছেন।

বিগত দু'শ বছরে বঙ্গদেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে নানা পঞ্জিকা প্রকাশিত হলেও সে সমস্ত পঞ্জিকার প্রচলন এখন আর নেই। গুপ্তপ্রেস ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা (১২৭৬ বঙ্গাব্দ), পিএম বাগচির ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা (১২৯০ বঙ্গাব্দ), বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা (১২৯৭ বঙ্গাব্দ), পূর্ণচন্দ্র ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা (১৩২৫ বঙ্গাব্দ), মদন গুপ্তের ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা (১৩৯০ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতি পঞ্জিকাগুলিই হলো বর্তমান কালের উল্লেখযোগ্য বাংলা পঞ্জিকা।

প্রথমযুগে ছিল কেবল পঞ্জিকা এখন ডাইরেক্টরি পঞ্জিকা। দশবিধ সংস্কার, মহেন্দ্রক্ষণ, শুভযোগের বিচার, বারব্রত ছাড়াও পঞ্জিকা প্রকাশকরা বুঝেছিলেন পাঠকের কাছে নানা তথ্য পৌঁছে দেওয়ার সেরা বাহন পঞ্জিকা। সঙ্গে তথ্য জুড়ে দিলে পঞ্জিকার গুরুত্ব বাড়বে, প্রতিযোগিতার বাজারে সে গুরুত্ব বাড়ানো অত্যন্ত জরুরী। ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের পিএম বাগচীর ডাইরেক্টরী পঞ্জিকায় দেখা যাচ্ছে নিত্যকর্ম, বারব্রত, নানাকৃত্যের ফর্দ্দ, তীর্থস্থানের তালিকার সঙ্গে সংযোজিত রয়েছে ডাকঘরের তালিকা, গঙ্গার ঘাট, উদ্যানের তালিকা এবং রেল সংক্রান্ত তথ্য। এখন যদিও এসব অপাংক্তেয় হয়ে গেছে। পঞ্জিকাকে সাধারণ মানুষ সাদরে গ্রহণ করে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে এর মধ্যে হিত ও সুখের সন্ধান পেয়েই। পঞ্জিকার মধ্যেই আমরা সেভাবে পাই সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্মভাবনা ও নানাদিকের বিস্তৃত দৃঢ়প্রত্যয়ী পরিচয়।

াংলা পঞ্জিকার মতভেদ ও মতান্তর

গণনায় গ্রহের যে অবস্থান পাওয়া যায় তা আকাশে দৃশ্যমান গ্রহের অবস্থানের সঙ্গে মেলে না। তার মানে এই গণনালব্ধ তথ্যাদি দৃক্‌সিদ্ধ নয়। তবুও অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকার

মূল তথ্যাদির গণনা আজও ওই সূর্যসিদ্ধান্ত ভিত্তি করেই চলছে। পঞ্জিকার সর্বপ্রধান অঙ্গ হলো তিথি আর সেই তিথি গণনার ব্যাপারে এদের একটিই মূল সংজ্ঞা, সেটি হ'ল—'বাণবৃদ্ধি রসক্ষয়'। এর অর্থ হল তিথি বৃদ্ধি ৬৫ দণ্ডের অধিক হবে না এবং তিথি হ্রাস ৫৪ দণ্ডের কম হবে না। কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানভিত্তিক গণনায় দেখা যায় তিথির সময়ের সীমা 'বাণবৃদ্ধি রসক্ষয়' এর সংজ্ঞা একেবারেই মেনে চলতে পারে না। এক এক সময় এমন হয় যখন অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা এবং দৃকসিদ্ধ পঞ্জিকাতে দেওয়া তিথির সময়ের পার্থক্য ছয় ঘণ্টা পর্যন্ত হতে দেখা যায়। আর গ্রহ অবস্থানে থাকে ১১ ডিগ্রির পার্থক্য। এই পার্থক্য প্রসঙ্গে প্রাচীনপন্থীরা বলে থাকেন, পাশ্চাত্য মতে 'বিম্বোৎক্ষিপ্তি' সংস্কার দ্বারা সূর্যের উদয় অস্ত গণনা করা হয় বলে অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকার সঙ্গে দিনমানের মিল হয় না। ফলে প্রতিদিন মুহূর্তের মানের পার্থক্য দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকায় দেখা যায়। এ কারণেই কোনও কোনও বছর দুর্গাপুজো ও সরস্বতী পূজোর তারিখ দুটি পঞ্জিকায় দু'রকম থাকে। প্রাচীনপন্থীরা বলেন, দিন মুহূর্ত হলো দিনমানের ১/১৫ অংশ এবং রাত্রি মুহূর্ত হলো রাত্রিমানের ১/১৫ অংশ। দৈনন্দিন শ্রাদ্ধাদি ও পুজোর ব্যবস্থা এই মুহূর্তমানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তাই পাশ্চাত্য মতের 'বিম্বোৎক্ষিপ্তি' অনুসারে সূর্যোদয় প্রমাণিত নয়। অদৃক্‌সিদ্ধ মতে গুহ্যসংগ্রহোক্ত বৈদিকবচনে সূর্যরশ্মি সহ সূর্যমণ্ডলের প্রকাশকেই উদয় বলে। তবে এই দুই মতাবলম্বীর মধ্যে উদয়াস্ত গণনা বিতর্ক

(এরপর ১১ পাতায়)

রেখেছ সিপিএম করে

পশ্চিমবাংলার সিপিএম তথা বামফ্রন্টের অপশাসনের ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, বিদ্যুৎ, শ্রম, কৃষি, প্রতিটি বিষয়ে ব্যর্থতার রেকর্ড হয়েছে। অভিজ্ঞতা বলে কেন্দ্রে যখন কংগ্রেস সরকার গড়ে তখন মজুতদারেরা হাতে স্বর্গ পায়। সিপিএমের সমর্থনে ২০০৪ সালে সোনিয়া-মনমোহন সরকার গঠন করার পরপরই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি শুরু হয়। দ্বিতীয় বার সরকার গঠন করার পরও আজও দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি আকাশচুম্বী। বাজপেয়ী সরকারের সময়কার মুগ-মুসুরীর ডাল ৩০-৪০ টাকা আজ ১০০ টাকার উর্দ্ধে। ভোজ্য তেল, চিনি সহ প্রায় প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যর মূল্য সর্বোচ্চ স্তর পেরিয়ে বিশ্বরেকর্ড করেছে। অথচ ২০০৪-এর জোটসঙ্গী সিপিএম তখন কোনও আন্দোলন করেনি আর এখন তো সিপিএম তার 'আইডেনটিটি' নিয়েই আতঙ্কিত। অথচ এই সিপিএম ক্ষমতায় আসার পূর্বে বাংলাকে মিটিং-মিছিলের রাজ্য বানিয়েছিল। এখন সিপিএম বা বামফ্রন্ট বড় লোকের দল। শিল্প নয়, শিল্পপতির সঙ্গে মিতালী। সেই কবে প্রয়াত বিনয় চৌধুরী প্রোমোটার-রাজের কথা বলে জ্যোতি বসুর মাধ্যমে বিতাড়িত হয়েছিলেন। সাত বারের জেতা সাংসদ হারাধন রায় রিগিং-এর সাংসদ বলে অভিযুক্ত হয়ে চলে গেলেন। এখন ক্ষমতার চিটেগুড়ে সিপিএম বা বামফ্রন্ট এমন আটকে গেছে যে ৩২ বছর ধরে ক্ষমতা ছাড়তে ভয় পাচ্ছে। এখন ঘুরে দাঁড়াতে তৃণমূল-কংগ্রেস জোট ভাঙ্গাই সিপিএম-এর একমাত্র কাজ। এবং এই কাজে তরমুজ কংগ্রেস, শিলিগুড়ি লাইন ছাড়া বুদ্ধ-বিমান-কারাতবাবুরা আর কিছু ভাবতে পারছেন না। সিপিএম-এর শাসনে শিক্ষকরা হয়েছে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত। সরকারি কর্মচারীদের কথা না বলাই ভালো। পুলিশ দলদাস। পাপে পরিপূর্ণ পশ্চিমবাংলার প্রশাসন। বাংলার সংস্কৃতি ধ্বংস রাজনীতির কবলে। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন অশান্ত। আর বাঙালী জাতির খ্যাতি সিপিএম পরিচালিত বামফ্রন্ট ৩২ বছরে অখ্যাতির চরমে নিয়ে যাচ্ছে। তাই বলা যায়—

খণ্ডিত বাংলার হে বঙ্গ জননী
রেখেছ সিপিএম করে মনুষ্য ক'রনি।

—বৈদ্যনাথ ঘোষ, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগণা।

মমতার রেল বাজেট

কেন্দ্রিয় রেলমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের (২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০) রেল বাজেটে ভাড়া না বাড়িয়েও দেশজুড়ে সার্বিক উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। দেশজুড়ে বহুমুখী প্রকল্প সামনে এনে উন্নয়নের পথ দেখিয়েছেন মমতা। এসব মমতার 'নাটক' এবং 'চমক'। গত বছর মমতা বন্দোপাধ্যায় রেল বাজেটে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা কতটা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে তার কোনও হিসাব বর্তমান রেল বাজেটে নেই। যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তা সুরক্ষিত করতে মমতা তার বাজেটে কোনও কার্যকর ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেননি। প্রায় প্রতিটি ট্রেন প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ছাড়ছে না এবং ১০/১২ ঘণ্টা দেরিতে দূরপাল্লার ট্রেনগুলি হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশনে আসছে। মানুষের সময়ের কোনও দাম নেই। এর কোনও প্রতিকারের ব্যবস্থাও নেই। প্রতি বছর ১০০০ কিলোমিটার নূতন রেল লাইন বসানো হবে বলে যে বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে তার পরিকাঠামো কি আছে? কতটা নূতন রেল লাইন বসানো হলো, কতটা হলো না, কেন হলো না, শূন্যপদে রেলকর্মী নিয়োগ করা হয়েছে কিনা, কত শূন্যপদ আছে, রেলে কত নূতন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, কতগুলি স্টেশন আধুনিকীকরণ করা হয়েছে, বড় বড় স্টেশনে সন্ত্রাসবাদী হামলা মোকাবিলার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে—এইসব প্রশ্নের কোনও উত্তর মমতার রেল বাজেটে নেই। তবে সামাজিক দায়বদ্ধতা রক্ষা করতে ক্যানসার রোগীদের বিনা পয়সায় রেলে ভ্রমণের মতো সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু রেলের জমিতে পানীয় জলের প্ল্যান্ট গঠন, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অটোহাব প্রভৃতি ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগকে এগিয়ে আনার আহ্বান জানানো হয়েছে। এর ফলে বেসরকারীকরণ প্রাধান্য পাবে বলে আশঙ্কা করা যেতেই পারে।

—অধ্যাপক আশিক রায়, বি. গার্ডেন, হাওড়া-৩।

স্ব-উদ্যোগী মানসিকতা গঠনেরই কাজ করে চলেছে ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ কনফেডারেশন

দীপক গঙ্গোপাধ্যায় ॥ কেরিয়ার মানে শুধু চাকরিই নয়, উপরন্তু ক্ষুদ্র-অতিক্ষুদ্র উদ্যোগের মাধ্যমেও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন তথা নিজস্ব ক্ষমতা বিকাশের জায়গা তৈরি হতে পারে বলে মন্তব্য করলেন ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ কনফেডারেশনের চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ডঃ এইচ পি কুমার। গত ১১ মার্চ দিল্লীর কনিস্টিটিউশনাল ক্লাবের স্পিকার হলে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া কনফেডারেশন অব স্কুল এণ্ড মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রিজ এ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে আয়োজিত ফিনান্স এবং মার্কেটিং শীর্ষক বিষয়ে বক্তব্য রাখতে এসে তিনি এই মন্তব্য করেন।

এই সর্বভারতীয় সেমিনারে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দিনশা প্যাটেল, অলইন্ডিয়া কনফেডারেশন অব স্মল এন্ড মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশনের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট সুদর্শন সারিন, কেন্দ্রীয় সরকারের মাইক্রো স্মল অ্যান্ড সিভিল এন্ট্রিপ্রিনারস (MSME) মন্ত্রকের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি তথা ডেভেলপম্যান্ট কমিশনার মাধব লাল (আইএএস), জি এন জি গ্রুপ-এর চিফ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এস কে আগরওয়াল, এস এস আই মন্ত্রকের সেক্রেটারি দিনেশ ভাই (আই এ এস) প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে একটি রঙিন স্মারক পত্রিকার উন্মোচন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দিনশা প্যাটেল। তিনি বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ শিল্পকে

আরও বেশী করে জনপ্রিয় তথা জনমুখী করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লঘু উদ্যোগ ভারতীর সর্বভারতীয় সভাপতি বিনোদ জৈন এবং মাল্টি স্টেট লঘু উদ্যোগ ক্রেডিট সোসাইটির সর্বভারতীর উপদেষ্টা গোপাল বিশ্বাস প্রমুখ।

ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন রাজ্যপাল বলেন, এই ধরনের শিল্পদ্যোগীরাই জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি।

ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কও এই ধরনের ভাবনা-চিন্তার বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে স্টেট ব্যাঙ্কের সর্বভারতীয় মার্কেটিং প্রশিক্ষক রাজেন্দ্র কুমার জানান।

অল ইন্ডিয়া লঘু উদ্যোগ ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের বিশেষ ধরনের ব্যাঙ্ক

সংবাদদাতা ॥ দেশের বৃহৎ শিল্পের জন্য সরকার তথা ব্যাঙ্কগুলি প্রভূত সহযোগিতা করে থাকে। কিন্তু দেশজুড়ে যে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা রয়েছেন—যারা জাতীয় অর্থনীতির প্রায় অর্ধেক অংশ জুড়ে রয়েছে, সম্প্রতি তাদের জন্যই একটি নতুন ধরনের ব্যাঙ্কের কথা তুলে ধরেছেন অল ইন্ডিয়া কনফেডারেশন অব স্মল এন্ড মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট সুদর্শন সারিন। গত ১৯ মার্চ দিল্লীতে ফাউন্ডেশনের সেমিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রীসারিন বলেন, এই অতিক্ষুদ্র স্ব-উদ্যোগী ব্যবসায়ী বন্ধুদের সহায়তার জন্যই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা ক্রমে এই ধরনের একটি ব্যাঙ্ক গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যার নামও তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে জানান—অল ইন্ডিয়া লঘু উদ্যোগ ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন। এই সংস্থার মাধ্যমে ইতিমধ্যে দেশের আটটি রাজ্যে শাখা বিস্তারের কাজও শুরু হয়েছে। এই ব্যাঙ্কের অন্যতম রূপকার তথা সর্বভারতীয় উপদেষ্টা গোপাল বিশ্বাস জানান, দেশের আলু-পিঁয়াজ বিক্রেতা থেকে হকার পর্যন্ত যারা অন্তত পাঁচ থেকে কুড়ি হাজার টাকা পেলেই ব্যবসা চালিয়ে নিতে পারেন এবং অন্যান্য পরামর্শ পেলে তারা ব্যবসায়ী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারবেন, এই রকম সহায়তা দেওয়াই এই সংস্থার উদ্দেশ্য হবে।

পোঙ্গল উৎসব : কেরলের নবান্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বাংলায় যা নবান্ন উৎসব কেরলে তাই পোঙ্গল নামে পরিচিত। গত ৬ মার্চ তিরুবনন্তপুরমের আত্তাকুলে এটি অনুষ্ঠিত হয়। কেরলের প্রায়

৩০ লাখ মহিলা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তারা তিরুবনন্তপুরমের আত্তাকুল শহরের ভগবতী মন্দিরে জড়ো হয় দেবীর আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য। এদিন সকলে মিলে খোলা আকাশের নীচে এই পোঙ্গল রাঁধেন এবং সেই রান্না দেবী ভগবতীকে নিবেদন করেন।

পোঙ্গল উৎসবের সূচনা হয় মন্দির প্রাঙ্গ ণ থেকে, তিরুবনন্তপুরমের সমস্ত রাস্তাঘাট, গলি—বলা যেতে পারে যে মন্দিরের দশ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে সমস্ত অঞ্চ ল জনমানব পূর্ণ ছিল।

বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে উচ্চপদস্থ সম্মানীয় ব্যক্তিগণ যেমন সরকারী আমলা, রাজনীতিবিদ এবং সিনেমা থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রী সকলে একত্রিত হয়ে এই পোঙ্গল রান্না করেন এবং দেবী ভগবতীকে সবাই মিলে একত্রিত হয়ে পোঙ্গল নিবেদন করেন (বাংলায় এরই নাম নবান্ন)। প্রতিবছর নয়দিন ধরে মন্দিরে পোঙ্গ ল উৎসব পালিত হয়। এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন পার্বতী ওমানাকুট্যাল, আই. পি. এস অফিসার শ্রীলেখা এবং চলচ্চিত্র অভিনেত্রী কল্পনা, চিপ্পি, বীণা, অ্যান্টনি এবং প্রিয়াঙ্কা প্রমুখেরা একত্রিত হয়ে পোঙ্গল রাঁধেন এবং দেবীর আশীর্বাদ গ্রহণ করেন।

মন্দির কর্তৃপক্ষের দাবী এ বৎসর "পোঙ্গল"-এ মহিলাদের অংশগ্রহণ এক রের্কড সৃষ্টি করেছে। গত বৎসর প্রায় ২৫ লাখ মহিলা অংশগ্রহণ করেন এই আত্তাকুল মন্দিরে যা সবরীমালা নামেও পরিচিত। এতো সংখ্যক মহিলা একসাথে একসময়ে উপস্থিত থাকার ফলে পোঙ্গল উৎসব গিনিজ বুক অফ ওয়ার্ল্ড রের্কডে ঠাঁই পেয়েছে।

ধর্মীয় রীতি-নীতি মেনে দেবীকে পোঙ্গ ল নিবেদন করার পরে এদিন সকাল সাড়ে দশটায় মন্দিরের পুরোহিত মুরলীধরণ নামবুদ্রিপাদ যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নিপ্রজ্বলন করেন। মন্দির প্রাঙ্গণেও অগ্নিপ্রজ্বলন করা হয়। অগ্নিকুণ্ডকে ঘিরে উচ্চস্বরে লাখো লাখো কণ্ঠ সমবেত মন্ত্র উচ্চারণ করে যা অবর্ণনীয়। এই উৎসব দেখার জন্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে সমাজের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিও উপস্থিত হন। এবারে যেমন প্লেব্যাক সিঙ্গার কে জে এ সুদাম, তার পত্নী প্রভা এবং তার ছেলে বিজয়, দেবাশ্বম মন্ত্রী কাঁন্দানাপল্লী রামচান্দ্রন প্রমুখ এসেছিলেন। যজ্ঞানি দর্শনের জন্য এই অনুষ্ঠানে তারা যোগদান করেন।

আত্তাকুল মন্দিরে পূজা সমাপ্ত হয় বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ। পুজো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাত্রে রাখা শান্তির জল তীর্থযাত্রীদের উপর ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এবং তীর্থযাত্রীরা এই জল আশীর্বাদ স্বরূপ গ্রহণ করেন। প্রায় ২০০ জন পূজারী এই পবিত্র জল ছেঁটানোর কাজে নিয়োজিত থাকে। গুরুথী পুজোর দ্বারা মন্দিরে আয়োজিত আটদিনের এই বার্ষিক উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

পোঙ্গল উৎসবকে কেন্দ্র করে কেরলের প্রশাসনিক ব্যাবস্থাকেও ঢেলে সাজানো হয়। ৩০০০ পুরুষ পুলিশ এবং ৬০০ নারী পুলিশ উৎসবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থানে দায়িত্বে থাকেন। পাছে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তাই শহরকে পুরো সি.সি.টি.ভি. ক্যামেরার মাধ্যমে নজরে রাখা হয়। এছাড়া হাজারো স্বেচ্ছাসেবক তীর্থযাত্রীদের সাহায্যের জন্য কাজ করেন। তাছাড়া কেরল রাজ্য পরিবহণ দপ্তর ছত্রবট্রগ্ন এবং দক্ষিণ ভারতীয় রেলওয়েজ-এর পক্ষ থেকেও তীর্থযাত্রীদের যাতায়াতের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়।

গঙ্গাধারা ভারতের প্রাণশক্তি : রামদেব

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গঙ্গা নদীর স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য এক বিশেষ ধরনের আন্দোলনের কথা ঘোষণা করলেন যোগগুরু বাবা রামদেব। গত ১১ মার্চ দিল্লীর কনস্টিটিউশনাল ক্লাবের স্পিকার হলে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে তিনি বলেন, শুধু আধ্যাত্মিক বিশ্বাসই নয়, গঙ্গাজল এবং তার ধারা নিয়ে বৃটিশ আমল থেকেই বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। সব পরীক্ষাতেই গঙ্গাজল এবং তার ধারার বিশেষত্ব প্রস্ফুটিত হয়েছে। কৃষিভিত্তিক ভারতবর্ষের সুজলা-সুফলা শস্যা শ্যামলার ভিত্তিই হলো গঙ্গা, তাই বিকাশের নামে তার গতি রুদ্ধ করার চেষ্টা হলে ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক তথা প্রকৃতির উপর ভয়ংকর পরিণতি নেমে আসবে।

ওইদিনের সভায় রামদেবজীর বক্তব্যকে সমর্থন জানান একাধিক মঠ-মন্দিরের সাধু-মহাত্মা, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সভাপতি অশোক সিঙ্ঘল এবং উপস্থিত লোকসভার কয়েকজন সাংসদও।

প্রশ্নোত্তরপর্বে রামদেবজী বলেন, কেন্দ্র সরকার বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ার যে উদ্যোগ নিচ্ছে তা অত্যন্ত ভাল। কিন্তু বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বিকাশ বা উন্নয়নের নামে যা হচ্ছে ভারতবর্ষের আবহমানকাল ধরে চলে আসা ভাবনাচিন্তার পরিপন্থী। বিজ্ঞানীদেরই বক্তব্য, গঙ্গার জলে এক ধরনের বিশেষ ব্যাকটেরিয়া রয়েছে যা ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়াগুলোকে দ্রুত ধবংস করে দিতে পারে। আসলে দুরভিসন্ধিকে সিদ্ধ করতে সস্তায় মানুষের মন পেতে এরা বিজ্ঞানের নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে। স্থানে স্থানে গঙ্গাকে বাঁধ দিয়ে বেঁধে দেবার চেষ্টা হলে দেশজুড়ে একদিকে প্লাবন এবং আরেকদিকে খরা দেখা দেবে।

কলির অভিমন্যু

বি স কে, কলকাতা॥ মাতৃগর্ভে থাকাকালীন পিতামাতার মধ্যে একাধিক ভাষায় আলাপ আলোচনার ফলে শিশুও একাধিক ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এমনটাই ধরা পড়েছে এক সমীক্ষায়। মনোবিজ্ঞান সম্পর্কিত এক সম্মেলনে এমনই এক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। বৃটিশ-কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফ্রান্স ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের গবেষকরা সম্প্রতি এই এক চাঞ্চ ল্যকর তথ্য আবিষ্কার করেছেন। ইংরেজি এবং ডাগালগ নামে স্পেনের স্থানীয় ভাষা সম্পর্কে সে দেশের শিশুরা আগ্রহের সঙ্গে শুনতে থাকে। প্রতি দশ মিনিটে দুই ভাষার কথোপকথন শুনে দুই ভাষা সম্পর্কেই তারা আগ্রহ প্রকাশ করছে বলে সমীক্ষায় দেখা গেছে।

এমনটা ঘটেছিল মহাভারতের অর্জুন পুত্র অভিমন্যুর ক্ষেত্রেও। চক্রব্যুহে ঢোকার বিষয়ে যখন অর্জুন সুভদ্রার সঙ্গে আলোচনা করছিলেন, সেসময় অভিমন্যু ছিলেন মায়ের গর্ভে। সুভদ্রা অর্জুনের চক্রব্যুহে ঢোকার কৌশল শোনার সময় তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়েন। ফলে চক্রব্যুহে প্রবেশের কৌশল সম্পর্কে অভিমন্যু জ্ঞাত হলেও বাইরে বেরোনোর কৌশল শুনতে পাননি। মনোবিজ্ঞানের এমন কাহিনী প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রগুলিতে পাওয়া যায়। পরে তার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে প্রমাণও হয়। যেমন আরও এক উদাহরণ হলো, সূক্ষ্মদেহে স্থানান্তরে গমন। যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী এমন অভিজ্ঞতা এক ইংরেজ পদাধিকারীকে প্রত্যক্ষ করিয়েছিলেন। মহাকাশে তারই আদলে চিন্তা-কেন্দ্রের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদানের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। যদিও বিষয়টি সফল হবে কিনা সন্দেহ। কারণ এমন বাণিজ্যিকিকরণ হয়তো বা মানসিক সংযোগের ক্ষেত্রে সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ বাহ্যিকভাবে অত্যাধুনিক মহাকাশ যানের সাহায্যে আমরা তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ। এবং সেগুলি প্রামাণ্য নথি সংগ্রহেও সমর্থ হই।

অন্যদিকে চিন্তার মাধ্যমে তথা আদান-প্রদান প্রত্যক্ষ জ্ঞান হিসাবে গণ্য নাও হতে পারে। যদিও তা প্রাথমিক পর্যায়ে খুবই সহায়ক ও ব্যয় সাশ্রয়কারী হতে পারে।

উত্তরাখণ্ডে ললিতকলা বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ এক সময়ে বিশ্বের কাছে সমাদৃত ছিল বাংলার মুর্শিদাবাদের সিল্ক, কাঁসার শিল্প, বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা, নদীয়ার তাঁত। স্বাধীনোত্তর ভারতে তা আজ স্মৃতির পাতায়। এবার সেই শিল্পকে স্বমহিমায় ভূষিত করতে চলেছে উত্তরাখণ্ডের বিজেপি সরকার। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ রমেশ পোখরিয়াল এবং 'বহু উদ্যোগিক বিত্ত ও বিকাশ নিগম'-এর মন্ত্রী বিজয় মণ্ডলের সাম্প্রতিক বিবৃতি অনুযায়ী উত্তরাখণ্ডে নবগঠিত ললিত-কলা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পেতে চলেছে। বাংলার মতো কাঁসার টেরাকোটা শিল্প ললিত-কলা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার হস্তশিল্প নিয়েই একটি বিভাগ থাকবে। তাতে বাংলা থেকে দু'জন প্রকৃত শিল্পী তথা শিক্ষককে নিয়োগ করা হবে। তারা হস্ত শিল্পের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি নির্দিষ্ট শিল্পের প্রকাশ ও বিকাশে যাতে সহায়ক হন সেদিকেও সরকার নজর দেবে।

পঞ্জিকার মতভেদ ও মতান্তর

(৯ পাতার পর)

এখনও পর্যন্ত অমীমাংসিত। ভারত সরকার বিশুদ্ধ ও বিজ্ঞানসম্মত পঞ্জিকা 'রাষ্ট্রীয় পঞ্চ াঙ্গ' প্রকাশ করলেও বাংলায় অদৃক্সিদ্ধ পঞ্জিকাই এখনও পর্যন্ত বেস্ট সেলার। ৩২ বছর কমিউনিস্ট শাসনে থেকেও বাঙালির গোঁড়ামি এখনও কাটেনি। প্রাচীনপন্থীরা অবশ্য বলে থাকেন, আমাদের দেশে ধর্মচর্চা শাস্ত্র মেনে হয়, বিজ্ঞান মেনে হয় না। যদিও আমাদের দেশে এখন বিজ্ঞান ও শাস্ত্রের সমন্বয় নিয়ে গবেষণা চলছে।

নঃ ভঃ

আই এস ও ৯০০০ ঃ ২০০৮ শংসাপত্রের দাবিদার

চেন্নাইয়ের তিন মন্দির

বি স কে, কলকাতা॥ চেন্নাইয়ের পার্থসারথি মন্দির, ধনদেউঠপানি মন্দির এবং কপালেশ্বর মন্দির পরিচ্ছন্নতার নিরিখে আই এস ও ৯০০০ ঃ ২০০৮ শংসাপত্র দাবি করেছে। রাজ্যের হিন্দু ধর্ম এবং দাতব্যালয় বিষয়ক মন্ত্রী কে আর পেরিয়াকারুপ্পন স্বয়ং এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

সম্প্রতি কোয়েম্বাটুরের সান্ধিপুরমের সিদ্ধি বিনায়ক মন্দির একই শংসাপত্র পেয়েছে। আই এস ও ৯০০৯ ঃ ২০০৮ একটি বিশ্বমানের মানবক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থায় যুক্ত সংস্থা যার শংসাপত্র প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়। যাতে গ্রাহকদের সেবায় সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে। মন্দিরগুলির স্থানীয় সম্পদ, হিসাব এবং পূজাপদ্ধতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হচ্ছে কিনা, তা আই এস ও কর্তৃক পর্যবেক্ষণ সম্পাদিত হয়েছে। চেন্নাইয়ের কপালেশ্বর মন্দির অন্যতম সমৃদ্ধ মন্দির। বার্ষিক আয় ৪ কোটি টাকা এবং স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ ২৫ কোটি টাকা।

আজও বাঙালী নববর্ষে সাহেবি গন্ধ

প্রীতি বসু।। দক্ষিণ ২৪ পরগণার মাগুরিয়া গ্রাম। গ্রামটির পথের নিশানা বলতে গেলে বলতে হয়—টালিগঞ্জের মহাত্মা গান্ধী রোডের উপর যে কবর-ডাঙ্গা, সেখান থেকেই কলকাতার গন্ধ গায়ে মেখে পথ চলে গিয়েছে নেপালগঞ্জে। এই নেপালগঞ্জেই যাবার পথে পাশ থেকে শাখাপথ ঘুরে গিয়েছে মাগুরিয়া গ্রামের দিকে। পথটা কিন্তু যথাযথ পথ নয়, মাঠ-জঙ্গল-আবাদ পেরিয়ে পৌঁছতে হবে মাগুরিয়া গ্রামে। সেখানকারই গৃহবধূ, গৃহিনী কাম ব্যবসায়ী, সোজা কথায় আনাজওয়ালী ঠাকুরাণীর তিন ছেলে-বৌ, নাতি-নাতনি নিয়ে ভরা সংসার। কর্তা তো আছেনই। প্রত্যেক পালা-পার্বন পালন করা তার চাই-ই চাই। জিজ্ঞেস করলাম—ও ঠাকুরাণী, ১লা বৈশাখ তো এসে গেল, কি অনুষ্ঠান করছো?

বছর চল্লিশের সাদামাটা অল্প দামের রঙীন শাড়ি পরা ঠাকুরাণী সলজ্জ ভঙ্গিতে বলল—বাবা, সে তো এলাহী ব্যাপার। চত্তিমাস-ভোরই তো সারাদিন একটু ফল-জল খেয়ে, সন্ধের পর দুটো আতপ চাল ফুটিয়ে খাই। সংকান্তির দিন ঝক্কি বাড়ে। শিবের মাথায় জল দেওয়া, দণ্ডিকাটা—সে অনেক ব্যাপার।

সেসব তো হলো চত্তিরের ব্যাপার। জিজ্ঞেস করলাম, তো ১লা বোশেখ কি করবে?

ওই হলো। সংকান্তির দিন একটু জিরেন দি। তা জিরেন দেবার কি উপায় আছে। পুরুতকে আগে-ভাগে বলে রাখবো ঠিকই— বলবোও। বাকি ছেলে-পুলে আছে, একটু তাড়াতাড়ি এস। মাথাও নাড়বে। সেই অনুযায়ী সংকান্তির দিনই সব ধুয়ে মুছে নারায়ণ বসানোর পিঁড়ি-টিড়ি সব সাজিয়ে রাখবো। মনে ভয় পুরুত এসেই তো হই হই ফেলে দেবে। গোছান না থাকলেই বেলায় আসবো বলে অন্য বাড়ি চলে যাবে। আবার যে কখন আসবে তার ঠিক থাকবে না। সব তো আমাকেই করতে হবে। বৌ-রা তো এখন থেকেই সেলের কাপড়চোপড় কিনতে শুরু করে দিয়েছে। সেদিন তো সেসব পরে সাজে-পাটেই ব্যস্ত হয়ে পড়বে। আর পুরুতের জন্য যে ভয় পাচ্ছি, তিনি হয়তো

ভোরে আসবেনই না। আসবেন ঠা-ঠা দুপুরে—যখন ভাজা-পোড়া হয়ে যাবো। তাও মুখ বুজেই সইতে হবে। বছরের প্রথম দিনই তো কোনও অসন্তুষ্টিতে যেতে পারি না—সংসারের মঙ্গল-অমঙ্গল, সব দায়ই যে আমার কাঁধে।

হেসে ফেলে বললাম, তা তোমার কত্তা কি করবেন?

কত্তার কথাতে পাকা গিন্নীও লজ্জা পেয়ে গেল। সলজ্জ হয়ে মুখ নীচু করে বলল—তিনি আর কি করবেন। একমাত্র কাজ তো তাড়িতে মৌজ হওয়া, আর এটা কর, সেটা কর হুকুম করা, তাই করবেন।

ভালমন্দ রাঁধবে না?—তা আবার রাঁধবো না, বাড়ি ভরা তো লোকের আনাগোনায়। তবে বৈকাল হতেই সবাই হালখাতা করতে ছুটবে। খাওয়া-দাওয়া সেরে মিষ্টির প্যাকেট হাতে রাত করেই বাড়ি ফিরবে। তবে নিশ্চি ন্দি নেই, নাতি-নাতনি-রা ধরে রেখেছে, দোসরা বোশেখ বড়জোর 'মদনমোহন' তলায় 'গোষ্টের মেলা' দেখাতে নিয়ে যাবে।

সেখান থেকে বিদায় নিয়ে পৌঁছলাম কবরডাঙ্গার খৃষ্টান অধ্যুষিত অঞ্চলে—অল্প বয়সী খৃষ্টান মেয়ে নন্দিতা, অপর্ণা, রেখা, ঝুলনের সাথে দেখা হলো। জিজ্ঞেস করলাম ১ জানুয়ারি তো নাচ-গান, কেক তৈরি, কেক খাওয়া ও খাওয়ানো, অনেক কিছুই করলে, তা ১লা বৈশাখ কি করবো? সবাই মিলেই হইচই করে উত্তর দিল—গোটা চৈত্র মাসই তো সেলের বাজারে ঘুরে ঘুরে শেষে মা-বাবার দেওয়া টাকায় হিসেবটিসেব করে বুঝে-শুনে ড্রেস কিনবো তারপর ১লা বৈশাখ সেগুলো পরে অনেক আনন্দ করবো।

ঝুলনের মা মনোরমা অল্প দূরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি কাছে এসে হেসে হেসে বললেন—আর আমার কাছে খাওয়ার বায়না করবে। এটা খাব, সেটা খাব, মেয়ের পছন্দ মুরগী, সেটা রান্না করতে হবে। একটা বিশেষ দিনে খেয়ে দুঃখ পাবে, তাতো হয় না। রান্না করতে করতেই কেটে যাবে ১লা বৈশাখ।

তা আপনারা তো ১ জানুয়ারিই আনন্দটা করে নেন। বাঙালীত্বও ভুলেই গেছেন।

না না, তা নয়। তবে আমরা খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত। যীশুর জন্মদিন ২৫ ডিসেম্বর, ১ জানুয়ারি আগে আগেই আসে বলে সেই রেশেই ১ জানুয়ারি একটু বেশী আড়ম্বর হয়। কিন্তু আমরা যে বাঙালী তা কি ভুলতে পারি!

পৈলানের মাঝবয়সী হাসিখুশী মেহেরবিবি। ছেলে-মেয়ে নেই। স্বামী কামালের ছোটোখাটো জরির কাজের ব্যবসা। নিজেও হাঁস-মুরগী পুষে দু-পয়সা রোজগার করে। জিজ্ঞেস করলাম—১লা বৈশাখ তো এসে গেল। সেদিন কি করবে? —আরে ও-দিন তো খুব আনন্দ করবো। কামালের ব্যবসার কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সবাইকে, আর কামালের দু-চার জন বন্ধুকেও আসতে বলে দেব। সকালবেলাই তারা এসে যাবে। সবাই মিলে বিরিয়ানি-ফিরিয়ানি রান্না করবো। তারপর খেয়েদেয়ে আমতলা টকিজ-এ সিনেমা দেখতে যাব। সিনেমা শেষ হ'লে বাইরে বেরিয়ে ঘট্টি-গরম আর চা খেয়ে যে যার বাড়িতে পিঠটান।

কলকাতার উচ্চ শিক্ষিতা বয়স্ক গৃহবধূ সুরমা। জিজ্ঞেস করলাম—১লা বৈশাখ কিভাবে কাটাবেন ভাবছেন?

১লা বৈশাখ সম্বন্ধে আমার বিশেষ কোনও 'ফিলিংস' নেই।

কেন কেন—সেলের জামা-কাপড় কিনবেন না?

আরে দূর, দূর। ওই একটা হুজুগ। দোকানের সব বিক্রি না হওয়া পড়ে থাকা কাপড়-জামা ডাং করে নিয়ে বসে সব। পোষাকী নাম বলে—'স্টক ক্লিয়ারেন্স সেল'। আসলে যত সব রদ্দি পচা মাল। আমি ওসব হুজুগে নেই।

হেসে ফোনে বললাম 'মহিলা বিল' যে পাশ হলো, মনে হচ্ছে না এটা আসছে ১লা বৈশাখের 'পুরস্কার'।

উত্তর পেলাম—ওই এক ভোটের ভাঁওতা।

সবই যে নেতিবাচক বললেন। ইতিবাচক কিছু বলুন।

একটু শান্ত হয়ে বললেন—ইতিবাচক কিইবা বলবো। এক বলতে হয়—কষ্ট পাওয়া মানুষের কষ্ট যেন আর না বাড়ে।

মাস্টার ডিগ্রি, গান ও সেলাই-এ ডিগ্রীধারী একমাত্র পুত্র সন্তানের জননী—বছর ৩৫-এর রিমঝিম। এখন ঘরকন্না ও ছেলেকে মানুষ করা দিয়েই তার দিন কাটে। স্বামী বড় কোম্পানীর বড় অফিসার—সংসার দেখার তার সময় কোথায়? রিমঝিম-কে জিজ্ঞেস করলাম—আসছে ১লা বৈশাখের জন্য কি ভাবছেন?

যত দামই হোক, 'ওরিফ্লেম'-এর লাল লিপস্টিকটা কিনতেই হবে।

বললাম আর কিছু করবেন না?

অঙ্গনা

তড়িঘড়ি বলে উঠলেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওইদিন ভগবানের কাছে বিশেষভাবে বলবো—ছেলে, লেখাপড়া আর আঁকাটাতে যেন ভাল হয়ে ফার্স্ট র‍্যাঙ্কটা দখল করতে পারে।

আয়ার কাজ করা গৃহবধূ রমা বলল—ইচ্ছে আছে, ১লা বৈশাখের আগে ঘরের ছাদটা পাকা করে ওইদিন নারায়ণ এনে পুজো করবো।

সত্তর ছুঁই ছুঁই বৃদ্ধা রেবাদেবী বললেন—চত্তিতেই মহাভারত-টা শেষ করে নিয়ে, ১লা বোশেখে 'গীতা' পড়ে নিয়ে 'মহাভারত'-টা আবার আরম্ভ করবো।

এত জনের সাথে কথা বললাম, কিন্তু কেউ বললেন না, ১লা বৈশাখ প্রার্থনা করবো—নতুন বছরটা সকলের ভাল যাক্।

ভাবলাম—কেন বলবেন! আন্তর্জাতিক ক্যালেন্ডার মতে ইংরাজী ফার্স্ট জানুয়ারিতেই তো সেটা বলা হয়ে গেছে। বৃটিশ চলে গেছে, কিন্তু আজও কি আমরা আত্মসচেতন হতে পেরেছি?

।। চিত্রকথা ।। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।। ৫

হরি সংকীর্তনের মাধ্যমে বাধাদানকারী কাজীকে হরিভক্তে পরিবর্তন।

সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য সাঁতরে গঙ্গার ওপারে গেলেন নিমাই।

কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ। নিমাই পণ্ডি ত থেকে হলেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।

গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর-এর সৌজন্যে। (চলবে)

একান্ত সাক্ষাৎকারে বাংলার বাইরে বাঙালী মন্ত্রী

বাংলায় আবার নেতাজী, স্বামীজী হবার পরিবেশ গড়ে উঠুক : বিজয় মণ্ডল

বাংলার বাইরে বাঙালী মন্ত্রী শ্রী বিজয় মণ্ডল। উত্তরাখণ্ড সরকারের বহু উদ্যোগিক বিত্ত এবং বিকাশ মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত। পরম্পরাগত কুম্ভমেলাকে হাতিয়ার করেই উন্নয়ন ও বিকাশের পথে হাঁটছে উত্তরাখণ্ডের বিজেপি সরকার। হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ পরিদর্শনের এক ফাঁকে সেই কর্মযজ্ঞের অন্যতম সেনাপতি শ্রীমণ্ডলের সঙ্গে মিলিত হন আমাদের প্রতিনিধি দীপক গাঙ্গুলী। তার সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতার কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে ধরা হলো এখানে।

প্রঃ আপনি কবে মন্ত্রী হলেন?

উঃ ২০০৭ সালের দীপাবলীর সময়।

প্রঃ কিভাবে খবর পেলেন যে আপনি মন্ত্রী হচ্ছেন? আগে থেকে কী জানতেন এরকম পদ পাচ্ছেন?

উঃ পদ বা মন্ত্রীত্ব নিয়ে কখনওই ভাবিনি। একজন সাধারণ কর্মী হিসাবে কাজ করে এসেছি। দীপাবলীর সময় ঘরে নাতনির সঙ্গে খেলা করছিলাম। এমন সময় মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ফোন এল যে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজী আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। আমি তো চমকে উঠলাম। ফোন ধরতেই উনি বললেন বিজয়জী দীপাবলী কা শুভেচ্ছা। একই সঙ্গে জানালেন আপনার জন্য এক বিশেষ উপহার, সঙ্গে সঙ্গে উনি বিষয়টি বললেন।

প্রঃ সে সময় আপনার কি মনে হচ্ছিল?

উঃ এই মন্ত্রকের নাম আমি আর বলতেই পারছিলাম না, সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশনে দেখি খবর প্রচার হচ্ছে এবং চারিদিক থেকে শুভেচ্ছা আসতে লাগলো ফোনে, আমি ধীরে ধীরে ধাতস্থ হলাম।

প্রঃ বেশ কয়েকমাস হয়ে গেল, কাজ কিভাবে করছেন?

উঃ আগে যেরকমভাবে সকলের সাথে মেলামেশা করতাম এখনও সেভাবেই কাজ করে চলেছি।

প্রঃ নতুন কিছুই করছেন না?

উঃ নতুন বলতে সরকারি যে যোজনা এই মন্ত্রকের রয়েছে দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসাবে তা তো করতেই হবে। তাই করছি।

প্রঃ সময় কি আগের মতোই দিচ্ছেন নাকি বেশি দিতে হচ্ছে?

উঃ স্বাভাবিকভাবেই বেশি দিতে হচ্ছে। অনেক মানুষ আসছেন, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হচ্ছে। তাদের অভিমত শুনতে হচ্ছে, সরকারি-বেসরকারি অনুষ্ঠানে যেতে হচ্ছে, সময়তো বেশি দিতে হচ্ছেই।

প্রঃ ব্যক্তিগত দিক থেকে এই ধরনের প্রাপ্তিকে কিভাবে দেখছেন—একটা চরম সাফল্য নাকি আকস্মিক প্রাপ্তি?

উঃ আমি সারাজীবনই দেশমাতৃকার একজন সেবক হিসাবে নিজেকে মনে করেছি। সেভাবেই কাজ করেছি। সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছি। এবারও তা-ই মনে করছি। তবে এতবড় দায়িত্বের জন্য স্বাভাবিক ভাবেই আনন্দ হচ্ছে। কিন্তু এর চাইতে আর বেশি কিছু না। সাফল্য বা প্রাপ্তি এই ধরনের বিচারে আমি বিশ্বাসই করি না।

প্রঃ হঠাৎ এই রকম পদ আপনাকেই দেওয়া হলো কেন? আপনি বাঙালী বলে নাকি আপনার কাজের সুনামের জন্য?

উঃ বাঙালী হিসাবে আজও নিজেকে গর্ব করি। কেননা স্বামী বিবেকানন্দ, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মহান মানুষ বাংলায় জন্মেছিলেন। তাঁরা বাংলায় কথা বলতেন। কিন্তু তার জন্য অন্য ভাষা বা ভাবনার প্রতিও কোন রকম বিরূপ মনোভাব মনে প্রশ্রয় দিই না। কেননা আমরা সকলেই ভারতমাতার সন্তান। কবির ভাষায়—"নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।" এই মহান কাজের বাস্তবায়নের একজন সামান্য কর্মী হিসাবে কাজ করেছি, করছি, করবোও। আমার উপরের অধিকারিরা

বিজয় মণ্ডল

আমাকে একাজের জন্য হয়তো এখন উপযুক্ত মনে করেছেন। তাই দায়িত্ব দিয়েছেন, আমি যথাসাধ্য তা পালন করছি।

প্রঃ কাল যদি আপনাকে দায়িত্ব মুক্ত করা হয় তাহলে সেটা কিভাবে নেবেন?

উঃ এ কাজই তো করেছি, করবো। যে স্বপ্ন নিয়ে কাজ করছি তার কতটা পূরণ হলো সেটাই বেশি ভাবি। দায়িত্ব তো আপাতত অনেক এসে গেছে।

প্রঃ এখানে কতদিন ধরে আছেন?

উঃ তিন প্রজন্ম ধরে।

প্রঃ বাংলার কোথায় আপনার বাড়ি ছিল?

উঃ নদীয়া জেলার রাণাঘাটে। তবে মূলত আমরা পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার।

প্রঃ এখানে কিভাবে এলেন?

উঃ দেশভাগের সময়ই আমাদের মতো বহু পরিবার দীনেশপুর, নৈনিতাল, পিলভিট-এ চলে এসেছে, তারাও কয়েক প্রজন্ম ধরে বসবাস করছে।

প্রঃ এখানে অর্থাৎ দিনেশপুরে বাঙালীর সংখ্যা কত?

উঃ প্রায় পঞ্চাশ হাজার।

প্রঃ এই পঞ্চাশ হাজার বাঙালীর প্রতিনিধি হিসাবেই কি আপনাকেই বেছে নেওয়া হল?

উঃ আমাদের ভাবনা-চিন্তায় এই রকম সংকীর্ণতা নেই। তবে প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিক অনেক সিদ্ধান্তই নিতে হয়। এক্ষেত্রে অধিকারিরা কি ভেবেছেন সেটা তো তাদেরই ব্যাপার। যদি আপনার কথা অনুযায়ী হোত তাহলে তো আগেই হতো। বিজেপি তো সরকারে এইবারই প্রথম না। উত্তরাখণ্ড রাজ্য হবার পর বেশিরভাগ সময় তো বিজেপিই এখানে ক্ষমতায় থেকেছে।

প্রঃ বিজেপির সঙ্গে আপনি কতদিন যুক্ত?

উঃ (সহাস্যে) বিজেপির আগে থেকেই।

প্রঃ তার মানে?

উঃ বিজেপি যে ভাবনা-চিন্তায় বিশ্বাসী অর্থাৎ অখণ্ড ভারত, সমৃদ্ধ ভারত। আমি দেশভাগের পর এখানে আসার সময় থেকে ব্যথা-বেদনা বলুন, জ্বালা যন্ত্রণায় বলুন, ভারতবর্ষের অখণ্ডতা-সমৃদ্ধির ব্যাপারে সচেতন। সেই ভাবেই কাজ করে চলেছি।

প্রঃ তখন তো বিজেপি ছিল না—

উঃ বিজেপি তো আমাদের এই রকম ব্যথা-বেদনায় জর্জরিত মানুষদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের রাজনৈতিক মঞ্চ, তাই অখণ্ড ভারত, এক দেশ এক আইন, রামমন্দির নির্মাণের মতো বিষয়গুলো নিয়েই তো বিজেপি সোচ্চার।

প্রঃ অ-বিজেপিরা অখণ্ড ভারত, এক দেশ এক আইনের মতো বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে বলতে চাইছেন।

উঃ আমার বলা তো ইতিহাস থেকে, ঘটনা ঘটার থেকে, দেশবিভাজন কারা করলো! কংগ্রেস তথা গান্ধী পরিবার নয়? কমিউনিস্টরা বিভাজনের স্বপক্ষে মুসলিম লীগের সমর্থনে চিৎকার করেনি? জাতীয়তাবাদী নেতা শ্যামাপ্রসাদ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এদেরকে কারা গালমন্দ করেছে? কারা দেশ থেকে বিতাড়নের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকেছে। কংগ্রেস-কমিউনিস্টরা নয়? দেশে বিভেদকামী শক্তিগুলিকে কারা প্রশ্রয় দিচ্ছে? দেশের কোন রাজনৈতিক দল? সাধারণ মানুষ সেগুলি দেখছে না? উল্টো দিকে বিজেপি কি করছে? কি বলছে? সে তো প্রকাশ্যেই হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই তো চিত্র ফুটে উঠে।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীদের প্রতি আপনার কোনও বার্তা!

উঃ সে ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে সবসময়ে প্রার্থনা করি বাংলায় আবার নেতাজী, স্বামীজী হবার পরিবেশ গড়ে উঠুক। ভারতবর্ষের পরম বৈভবশালী হবার পথে বাঙালীর সেই মানসিকতার স্ফুরণ ঘটুক, বাংলা জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় পরিস্ফুট হয়ে আগের মতো ভারতবর্ষের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অগ্রসর হোক।

প্রঃ যদি আপনাকে বাংলায় রাজনীতি করতে বলা হয়।

উঃ নির্দেশ আসলে যাব। যদি আমাকে অধিকারিরা উপযুক্ত মনে করে দায়িত্ব দেন অবশ্যই তা আমি অনুশাসিত সেনার মতো আনুগত্য নিয়ে কাজ করবো।

প্রঃ ধরুন পাঠানোই হলো তা হলে কি করবেন প্রথমে?

উঃ গ্রামে গ্রামে যাব। মানুষকে বোঝাব যে নেতাজী, স্বামীজীর চিন্তাভাবনা কি। সেই অনুসারে সংগঠিত হওয়ার প্রয়াস চালাবো। অনুপ্রবেশ সমস্যা কিভাবে বাংলা তথা দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষতি করছে তা নিয়ে সোচ্চার হব।

প্রঃ বাংলার কোনও বিশেষ স্মৃতি!

উঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই ছড়া যা ছোট বেলায় পড়েছিলাম তা আজও মনে পড়ে—

আমাদের ছোট নদী, চলে আঁকে-বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে,
পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাড়ি
দুই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি।

পরলোকে মণিলাল বসু

নিজস্ব প্রতিনিধি।। হাওড়ার প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিক মণিলাল বসু গত ১১ মার্চ, বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর শিবপুরের বাড়িতে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। রেখে গিয়েছেন পুত্র ও তিন কন্যাকে। হাওড়ায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রায় সূচনাকালের স্বয়ংসেবক মণিলাল বসুর কিশোর বয়স থেকেই রাজনীতির প্রতি ঝোঁক ছিল বেশি। বাড়ি পূর্ববঙ্গের খুলনা জেলায়। দেশভাগের বেদনা বিদ্ধ করেছিল কিশোর মনকে। কলকাতায় এসেছেন ছিন্নমূল হিন্দুদের ত্রাতারূপে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে হৃদয়াসনে বসিয়ে। যোগ দিয়েছেন হিন্দু মহাসভায়, এসেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সংস্পর্শে। উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসনে হাওড়ায় সঙ্ঘ ও মহাসভার যাবতীয় উদ্যোগে সামিল হয়েছেন। উদ্বাস্তু ছেলেমেয়েদের জন্য গড়া বিদ্যালয়ে পড়ানোর দায়িত্ব নিয়েছেন। সেই সঙ্গে করেছেন সঙ্ঘের কাজ। এরই মাঝে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পড়া শেষ করেছেন। শ্যামাপ্রসাদ জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করলে যোগ দিয়েছেন তাতে। শিবপুর দীনবন্ধু ইনস্টিটিউশন (শাখা) বিদ্যালয়ে শুরু করেছেন শিক্ষকতার কর্মজীবন। শেষ করেছেন সংঘের প্রেরণাতে প্রতিষ্ঠিত 'শিবপুর শিক্ষালয়' উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে, বিগত নববইয়ের দশকে অবসর নিয়ে। জনসঙ্ঘ থেকে বিজেপি—রাজনীতির নিরবচ্ছিন্ন পদচারণায় জেলা থেকে রাজ্যে কতপদ, কত দায়িত্বই না সামলাচ্ছেন 'মণিদা'। নিষ্ঠা ও সুনামের সঙ্গেই। জনসঙ্ঘের হয়ে বিধানসভা কেন্দ্রে লড়েছেন। বিজেপি প্রার্থীরূপে উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রে লড়ে লাখ খানেক ভোট পেয়েছেন। হাওড়া শহর ও জেলায় সংঘ ও আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রের এমন কোনও গঠনকর্ম বা আন্দোলন মিলবে না যেখানে মণিদার স্পর্শ নেই। সব কিছুতে এত ব্যস্ততা সত্ত্বেও প্রচণ্ড পড়াশোনা করতেন তিনি। বইয়ের সংগ্রহও অজস্র। যে-কোনও বিষয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা চালিয়ে যেতে পারতেন। গভীরে কিছু জানতে হলে মণিদার শরণ নিতে হোত। অত্যন্ত সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনচর্যা, সদালাপী ও সদাহাস্যময় ব্যবহার মাধুর্য এবং যথার্থ প্রজ্ঞার জন্য 'মণিদা' অগণিত ছাত্র, শিক্ষক ও সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে ছিলেন অতি প্রিয় কাছের মানুষ।

তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ১৯ মার্চ সংঘের মহানগর কার্যালয় 'কেশব স্মৃতি'-তে এবং ২১ মার্চ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের দিন তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে দু'টি শ্রদ্ধাঞ্জলি সভার আয়োজন করা হয়। তাতে বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা, তথাগত রায় সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

* * *

মালদা বিভাগ বৌদ্ধিক প্রমুখ পীযূষ সাহার পিতৃদেব সাধন কুমার সাহা (৬৮) গত ৮ মার্চ পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি এক পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

মালদা জেলার রাজনগর খণ্ড সেবা প্রমুখ বিধান মণ্ডলের মাতা বুলকা মণ্ডল (৭০) গত ১২ মার্চ পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি ৪ পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গেছেন।

সাপ্তাহিক স্বস্তিকার মালিকানা সম্পর্কিত বিস্তৃত বিবরণ

১. প্রকাশনের স্থান ঃ ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬।২. প্রকাশনের সময় ঃ সাপ্তাহিক। ৩. মুদ্রকের নাম ঃ শ্রী রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। নাগরিকত্ব ঃ ভারতীয়। ঠিকানা ঃ ৫/৬, ওয়েস্ট পুটিয়ারি কলোনী, কলকাতা -৪১। ৪. প্রকাশকের নাম ঃ শ্রী রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। নাগরিকত্ব ঃ ভারতীয়। ঠিকানা ঃ ৫/৬, ওয়েস্ট পুটিয়ারি কলোনী, কলকাতা -৪১।
৫. সম্পাদকের নাম ঃ শ্রী বিজয় আঢ্য। নাগরিকত্ব ঃ ভারতীয়।
ঠিকানা ঃ ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা -৬। মালিকানা ঃ স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট।
ঠিকানা ঃ ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা -৬।
ট্রাস্টীর সদস্যবৃন্দ ঃ অধ্যাপক অমল কুমার বসু, ২৬, বিধান সরণি, কলকাতা -৬। শ্রী কালিদাস বসু, এ বি-২২৯, সেক্টর-১, বিধান নগর, কলকাতা -৬৪। শ্রী যুগলকিশোর জৈথলিয়া, ১৬১/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা -৭। শ্রী কেশবরাও দীক্ষিত, ৯-এ, অভেদানন্দ রোড, কলকাতা -৬। শ্রী জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী, ৬৪, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলকাতা -৬৭। শ্রী রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫/৬, ওয়েস্ট পুটিয়ারি কলোনী, কলকাতা -৪১। শ্রী সত্যনারায়ণ মজুমদার, পুড়াটুলী, মালদা। শ্রী অরুণ প্রকাশ মল্লাবত, ৯৫বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা - ৭৩। শ্রী দেবাশিস লাহিড়ী, ২/৫, সর্ট রোড, দুর্গাপুর - ৪। শ্রী প্রদীপ কুমার দে, ১০/৩৮, বিজয়গড়, পোঃ যাদবপুর, কলকাতা - ৩২।
আমি শ্রী রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বজ্ঞানে ও বিশ্বাসমতে ঘোষণা করিতেছি যে উল্লেখিত বিষয়গুলি সত্য।

তারিখ - ০৯.০৩.২০০৯

প্রকাশকের স্বাক্ষর

Ranendra Lal Bandyopadhyay

রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

শব্দরূপ - ৫৪২

কণিকা ভদ্র

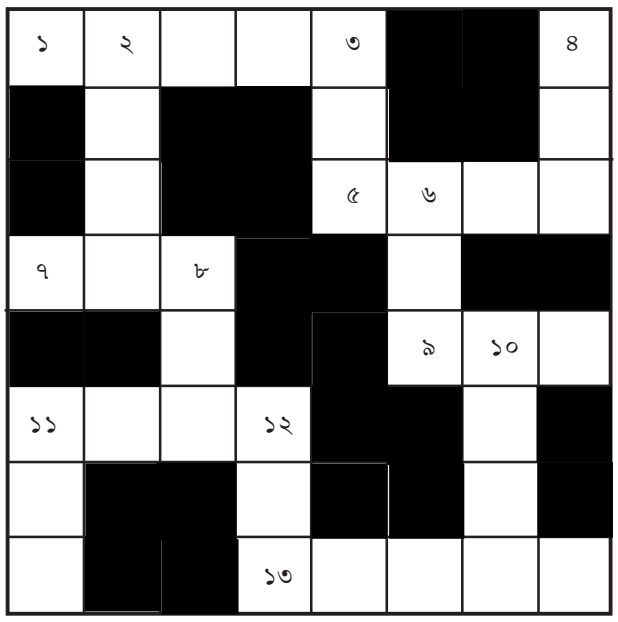

১	২			৩	■	■	৪
■		■	■		■	■	
■		■	■	৫	৬		
৭		৮	■	■		■	■
■	■		■	■	৯	১০	
১১			১২	■	■		■
	■	■		■	■		■
	■	■	১৩				

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. ইন্দ্রপুরী, দেবগণের বাসস্থান, স্বর্গ, ৫. চারটি তারবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, অন্য নাম তম্বুরা, ৭. পুরাণে বর্ণিত ত্রিভুবনের সর্বনিম্নস্থ ভুবন, ৯. ঢাক জাতীয় প্রাচীন রণবাদ্যবিশেষ, শেষ দুয়ে মাতুল, ১১. ঈর্ষা বা ক্রোধ মনোভাব, আলংকারিক অর্থে গায়ের জ্বালা, ১৩. নিত্যজ্ঞান সুখরূপ ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, একে-চারে বৎসর, তিনে কাটারি, শেষ দুয়ে শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা।

উপর-নীচ ঃ ২. সরস্বতী দেবী, ৩. প্রতিশব্দে প্রচণ্ডতা, উগ্রতা, ৪. আগ্রার নিকটস্থ নগর (শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ভূমি), ৬. বিন্ধ্যপর্বত থেকে নির্গতা নদী, অন্য নাম রেবা নদী, শেষ ঘরে কাটারি, ৮. লম্বা ঢিলা পোষাক বিশেষ, শেষ ঘরে বঁটি, দুয়ে ইঙ্গ উপসাগর, ১০. অগুরু দ্বারা সুবাসিত শতভার গঙ্গাজলে বা শতঘট তীর্থজলে প্রতিমার অবগাহন, ১১. অর্জুনের ধনু, এটি ব্রহ্মা নির্মাণ করেন, ১২. ব্রহ্মার বাহন, সূর্যের এক নাম, আবার একজন ক্ষত্রিয় বীর, এঁর ভ্রাতা ডিম্বক।

সমাধান শব্দরূপ - ৫৪০

■	ব	ন্দ	না	■	ম	■	বি
■	লি	■	গ	■	ক	ব	জ
নৃ	■	■	ফ	তু	র	■	য়া
মু	ক্ত	বে	ণী	■	■	■	দ
গু	■	■	■	ক	টি	দে	শ
মা	■	ক	ল	ম	■	■	মী
লি	টা	র	■	গু	■	মা	■
ণী	■	ভ	■	লু	স্বি	নী	■

সঠিক উত্তরদাতা

ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া, বেড়াবেড়িয়া, বাগনান, হাওড়া-৩
শৌনক রায়চৌধুরী, কলকাতা-৯
সুনীল বিষ্ণু, সিউড়ি, বীরভূম

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৪২ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৯ এপ্রিল, ২০১০ সংখ্যায়

বিশ্বকাপ হকি

অস্ট্রেলিয়া চ্যাম্পিয়ান, ভারত ঠিক জায়গায়

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ভারতীয় হকিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে যাচ্ছে আর খেলোয়াড়, কোচ, কর্মকর্তারা দায়িত্ব নিয়ে সেই স্বপ্নের সলিলসমাধি করে যাচ্ছেন। সদ্যজাত কোনও শিশুও আর তার পূর্ণ জীবনে ভারতীয় হকি দলকে পদক পোডিয়ামে দেখবে না, একথা গ্যারান্টি দিয়েই বলা যায়। আর তার জন্য ফেডারেশন কর্তা থেকে সাধারণ ক্রীড়াপ্রেমী কারুরই কোনও মাথাব্যথা নেই। সদ্য সমাপ্ত দিল্লি বিশ্বকাপ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেল বিশ্বপর্যায়ে ঠিক কোন জায়গায় ভারতের অবস্থান। অস্ট্রেলিয়া যেমন যোগ্য দল হিসেবেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, ভারত প্রত্যাশামতোই সেমিফাইনালে উঠতে ব্যর্থ এবং গত তিনটি বিশ্বকাপের মতোই একটা নির্দিষ্ট বৃত্তে আটকে। প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানকে হারানোটাই হয়ত কাল হলো ভারতের। পাকিস্তানকে ৪-১ গোলে হারিয়ে যেন বিশ্বকাপটাই জিতে ফেলেছে ভারত, এমন হৈ-চৈ চারিদিকে। পত্রপত্রিকা, টিভি চ্যানেল সর্বত্রই সন্দীপ, রাজনাথদের মহানায়ক বানিয়ে ফেলা হলো। ভারতীয় ফানুস তারকাদের মাটিতে সপাটে আছড়ে ফেলে অস্ট্রেলিয়া, পরের ম্যাচেই। আর তাতে পেরেক পুঁতে কবরস্থ করে দেয় স্প্যানিয়াড-রা। দুটি দেশের সঙ্গে ম্যাচে ভারতীয় আক্রমণ, মাঝমাঠ, রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা শুধু বল তাড়া করে গেছে। গতি, শক্তি, স্কিল, ট্যাকটিক্স সব ক্ষেত্রেই অস্ট্রেলিয়া, স্পেন, ইংল্যাণ্ড ভারতের খেলোয়াড়দের নিতান্তই এলেবেলে প্রমাণ করে দেন। দক্ষিণ আফ্রিকা, আর্জেন্টিনার মত দুর্বল দলকে হারাতে পারেনি ভারত।

নিজের দেশে যদি এই পারফরমেন্স হয় তবে বিদেশের মাঠে সমস্তরকম প্রতিকূলতার মধ্যে কি ফল হবে তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। অন্যদিকে দেখুন অস্ট্রেলিয়াকে। কি চমৎকার, ছন্দোবদ্ধ হকি খেলে গেল গোটা টুর্নামেন্ট জুড়ে। তাদের সুইপিং ডিফেন্ডার মার্ক ডোয়ের্নার ৮টি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা ও জেমি ডইয়ার ধারাবাহিকতার নিদর্শনে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন। প্রচণ্ড গতির সঙ্গে রোভিং স্কিল মিশিয়ে প্যাটার্ন উইভিং হকি খেলে অজিরা আধুনিক হকির সংজ্ঞাটাই বদলে দিয়েছেন। হল্যাণ্ড, জার্মানি, স্পেনকে মাথা তুলতে দেয়নি রিক জেমস, চার্লসওয়ার্থের ছেলেরা।

তারকা কোচ চার্লসওয়ার্থ প্রতিটি ম্যাচে নতুন নতুন উদ্ভাবনী ট্যাকটিক্স ও সিস্টেমের চমকানিতে চমকে দিয়েছেন। এই চার্লসওয়ার্থই কিনা একবছর আগে ভারতের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর ছিলেন। হকি কর্তাদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও খেলোয়াড়দের অসহযোগিতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে ভারত ছাড়েন বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার তথা শিশু চিকিৎসক চার্লসওয়ার্থ। তিনি কোচ কাম ম্যানেজার হিসেবেই যে কতটা পরিণত তার প্রমাণ এবারের বিশ্বকাপ। তাঁর অধিনায়কত্বে অস্ট্রেলিয়া প্রথম বিশ্বকাপ পেয়েছিল ১৯৮৬-তে লণ্ডনের মাঠ থেকে। আর তার কোচিং দক্ষতায় দ্বিতীয়বার কাপ জিতল অস্ট্রেলিয়া। যে কৃতিত্বের সঙ্গে তুলনা টানা যায় বিশ্ব ফুটবলের কিংবদন্তী চরিত্রদ্বয় বেকেনবাউয়ার ও জাগালোর।

এবারের বিশ্বকাপ অবশ্য শুধু 'অজি' বাহিনীর জয়জয়কারেই সীমাবদ্ধ নয়। হল্যাণ্ড, জার্মানি, স্পেন, ইংল্যাণ্ড এই চার দলও শিল্পের সঙ্গে শক্তির মেলবন্ধনে উন্নত মাত্রার হকি মেলে ধরেছে। যে ধ্রুপদী, আক্রমণাত্মক ও গতিশীল হকির জন্য ভারত ও পাকিস্তান সারা বিশ্বে সমাদৃত ছিল। তা যেন হাইজ্যাক করে নিয়ে গেছে ইউরোপের দলগুলি। সনাতন সুরিয়ালিস্টিক হকির সঙ্গে ইউরোপিয়ান রিয়েলিস্টিক হকিকে চমৎকার সমন্বয় করে একবিংশ শতাব্দীর হকির চূড়ান্ত বিবর্তন ঘটিয়ে ছেড়েছে এই দলগুলি। ভারত, পাকিস্তান পড়ে আছে সেই মান্ধাতার আমলে। কি করে এই 'স্পেস এজ' হকির সঙ্গে এঁটে উঠবে ভারতীয়রা? তাদের যে প্রাচ্যের জাদুবিদ্যাটাই হারিয়ে গেছে।

স্পেনের পিটার আমাত, জর্জ আলেপ্রে, ইংল্যাণ্ডের জো মন্টেল, হল্যাণ্ডের তাইকামা, ভ্যানডার ফ্রস্ট, জার্মানির স্টেইকি মুলার, আর্জেন্টিনার জর্জ ল্যাম্বিরা সারা বিশ্বের হকি সাংবাদিকদের ভোটে নিজ পজিশানে সেরা খেলোয়াড় মনোনীত হয়েছেন। কোনও পজিশানেই কোনও ভারত, পাকিস্তান বা দক্ষিণ কোরিয়ার খেলোয়াড় নেই। এশিয়ার এই তিন দেশই এবার চূড়ান্ত ব্যর্থ। ইদানিং এশিয়ার পতাকা তুলে রাখার গুরুদায়িত্ব পালন করে আসছিল দক্ষিণ কোরিয়া। এবার তারাও ব্যর্থ। বেশ বোঝা যাচ্ছে এশিয়ার গৌরব সূর্য অস্তমিত, ভারত তো গত তিরিশ বছর কোনও বিশ্ব পর্যায়ের টুর্নামেন্টে সেমিফাইনালেই উঠতে পারেনি। তবু পাকিস্তান ১৯৯৪-এ বিশ্বকাপ ও ২০০৫-এ মিনি বিশ্বকাপ জিতেছে। কোরিয়া ২০০০-এ অলিম্পিক রানার্স। এছাড়া গতবারের বিশ্বকাপ সেমিফাইনালিস্ট। চ্যাম্পিয়ান ট্রফিতেও বেশ কয়েকবার হারিয়েছে পাশ্চাত্যের শক্তিশালী দলগুলিকে। অথচ এবার ভারত তথা এশিয়ার মাটিতে বিশ্বকাপ হলো আর এশিয়ার হকি তার যাবতীয় কৌলীন্য হারিয়ে বাঁচার জন্য নতুন করে পাশ্চাত্যের দিকদর্শনের ওপর নির্ভরশীল হবে।

ভারত-পাক বৈঠক ও চুক্তি

জাতির সঙ্গে পুনঃ পুনঃ প্রতারণা

শিবাজী গুপ্ত

স্বাধীনতার নামে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রাক্কালে মুসলিমলীগ নেতা মিঃ জিন্না একাই কূটবুদ্ধি ও কথার মারপ্যাঁচে গান্ধী-নেহরু সমেত তাবড় তাবড় কংগ্রেস নেতাদের ঘোল খাইয়ে পাকিস্তান আদায় করে নিয়েছে। সেই রক্তরাঙা ইতিহাস সম্পর্কে বর্তমান শাসকগোষ্ঠী তো বটেই, বিরোধী দলনেতারা আদৌ ওয়াকিবহাল কিনা তাতে ঘোর সন্দেহ আছে। মিঃ জিন্নার রক্তচক্ষুর সামনে জাতীয় নেতারা অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন; নেকড়ের মুখে হিন্দু-শিখদের ছুঁড়ে দিয়ে দেশভাগ মেনে নিয়েছেন। আক্রমণকারীকে দংশন করা তো দূরের কথা, ফোঁস করতেও নিষেধ করেছেন। তারা একবার যদি হিন্দুদের আত্মরক্ষার ডাক দিতেন, তা হলে হিন্দুরা সারা ভারতে কলকাতা-বিহার কাণ্ড ঘটিয়ে মা-বোনের ইজ্জত রক্ষায় প্রাণ দিত; নোয়াখালি গিয়ে মুসলমানদের দুয়ারে দুয়ারে কাঁদতে হতো না।

পরিণতিতে দুরাত্মারা শায়েস্তা হলো না; শুধু একজনই মা হারা হলেন। নেতারা নিজেরা বেঁচেছেন, কিন্তু তাদের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা, হটকারিতা ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের হিন্দুবিদ্বেষ ও রক্তপিপাসু-স্বভাবের শিকার হয়ে প্রাণ দিতে হয়েছিল লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নরনারীকে।

অথচ মুসলমান নেতারা তাদের অন্তিম লক্ষ্য অর্থাৎ পাকিস্তান কায়েম করতে যে কোনও প্রকার নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার আশ্রয় নিতে পেছপা হবে না, তা অত্যন্ত স্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে আগে ভাগে জানিয়ে দিয়েছে। যেমন—

১। আমাদের হাতে পিস্তল আছে এবং তা ব্যবহার করতে জানি—মিঃ জিন্না।

২। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম মানে কি;মুসলমানরা তা জানে, তাদের শেখাতে হয় না—মিঃ নাজিমুদ্দীন।

৩। চক্রবৃদ্ধি হারে হিন্দুর রক্ত দিয়ে মুসলিম জীবনহানির শোধ তুলতে হবে—মিঃ গজদার।

৪। মুসলমানরা যে বীভৎস কাণ্ড ঘটাবে, তাতে হালাকু খানও লজ্জা পাবে —ফিরোজ খাঁ নুন।

ভারতীয় বিদেশ সচিব নিরুপমা রাওয়ের সঙ্গে পাক বিদেশ সচিব সলমন বশির।

৫। পাকিস্তান কায়েম করতে প্রয়োজনে বিরোধীদের রক্তপাতেও দ্বিধা করা হবে না; মুসলমানরা অহিংসায় বিশ্বাসী নয়—আবদুর রব নিস্তার।

মুসলিম লীগ নেতাদের যে কথা সেই কাজ। তাদের কথা ও কাজে দ্বিচারিতা ছিল না। হিন্দুদের হাড়হিম করা ও মুসলমানদের রক্ত গরমকরা প্রকাশ্য ঘোষণায় ও প্রত্যক্ষ সংবাদ মারফত নিজেদের সকল কার্য রূপদানের ফলে দেশ ভাগ হল, পাকিস্তান কায়েম হলো। মেরুদণ্ডহীন কংগ্রেস নেতাদের বাগাড়ম্বরে ভুলে, মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে আস্থা স্থাপন করে, হিন্দুরা বেঘোরে মারা গেল। নেহরু গদিতে বসে আরামে চোখ বুঁজে রইলেন;আর গান্ধীজী সকাল-বিকাল রামধুন কীর্তনে মেতে রইলেন।

সুতরাং জন্মলগ্নে যে রাষ্ট্রের এমন ক্লেদাক্ত ও রক্তাক্ত ইতিহাস, এবং জন্মদাতাদের এমন জঘন্য ঘৃণা, বিদ্বেষ ও হিংস্র স্বভাব, সে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনেতাদের চরিত্র বদলের কোনও সম্ভাবনা যে নেই, তা গত ৬২ বছরের ইতিহাসে বারংবার দেখা গেছে। আমাদের রাষ্ট্রনেতারা পাকিস্তানী মানসিকতার বদল ও চরিত্র সংশোধনের অলীক আশায় বুঁদ হয়ে আছেন এবং পুনঃপুনঃ প্রতারিত হওয়া সত্ত্বেও তারা গান্ধী-নেহরুর ঐতিহ্য অনুসরণ করে পাকিস্তানী প্রেমরূপ সোনার হরিণের পেছনে ছুটে চলেছেন। সদ্য সংঘটিত পুনা বিস্ফোরণের পরেও তাদের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়নি। তাদের যত হম্বিতম্বি মেড়ার কোঁদনের মতোই অসার। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোনওরূপ কড়া ব্যবস্থা নিতে কেন্দ্রীয় সরকার অক্ষম অপারগ। তারা পাকিস্তানের সঙ্গে আর একখানা শান্তি চুক্তি করার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন। অতীতে যেমন নেহরু-লিয়াকত, নেহরু-নুন, নেহরু-আইয়ুব, লালবাহাদুর-আইয়ুব, ইন্দিরা-ভুট্টো, বাজপেয়ী-মুশারফ ইত্যাদি চুক্তি করে প্রতারিত হয়েছেন;দেশ ও জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন।

একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র এবং ভারত একটি অ-মুসলিম রাষ্ট্র। জন্মাবধি পাকিস্তান ভারতকে শত্রু রাষ্ট্র বলেই মনে করে। ইসলাম ধর্মের শিক্ষা ও নির্দেশ অনুযায়ী অমুসলিম রাষ্ট্র ভারতের ক্ষতি ও ধ্বংসসাধনই পাকিস্তানের রাষ্ট্রনীতি। তার থেকে বিরত ও বিচ্যুত হলেই তো হবে ধর্ম বিরোধী কাজ। "অমুসলমানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না"—কোরানের এই মহৎ বাণী (?) মুসলমান শাসকগণ অগ্রাহ্য করবে কোন্ সাহসে?

মুম্বাই বিস্ফোরণে পাকিস্তানী সন্ত্রাসীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের জেরে আন্তর্জাতিক স্তরে যখন প্রায় একঘরে অবস্থা, তখন পাকিস্তানী নেতাদের কথার মারপ্যাঁচ, সকাল-বিকাল উল্টো পাল্টা বিবৃতি, কবুল করা কথা থুথুর মতো গিলে ফেলা—এসব বাক্‌জালের কসরতে তাদের ইসলামী চরিত্রই প্রকাশ পেয়েছে। পাকিস্তানী রাষ্ট্র নায়কদের এবংবিধ আচরণে অনেক প্রাজ্ঞবিজ্ঞ ভারতবাসীই অবাক হচ্ছেন। তাদের এই অবাক হওয়া দেখে অবাক হতে হয়। ইসলাম ধর্মের মূলতত্ত্ব ও মুসলিম মানসিকতা সম্পর্কে তিলমাত্র জ্ঞান থাকলে তারা সবাক হতেন; সেকুলারদের মতো নির্বাক হতেন না। নির্বাক হয়ে থাকা প্রকারান্তরে পাকিস্তানী বর্বরতাকে সমর্থনের সামিল। মুম্বাইর নৃশংস কাণ্ডে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনও নিন্দাসূচক বিবৃতি নেই, প্রতিবাদ সভা শোভাযাত্রা বিক্ষোভ সমাবেশ মহামিছিল ধর্না পথ অবরোধ নেই—সেকুলারিস্টদের এই মহামৌনতা কি অর্থপূর্ণ নয়?

এদিকে সোনিয়া-মনমোহন-এ্যান্টনি-চিদাম্বরম্-প্রণবদেরও কিছু করে দেখাবার হিম্মৎ নেই;শুধু বাক্ চাতুরিতে দেশবাসীকে ভোলানো এবং রাষ্ট্রদূতদের কাছে কাঁদুনি গাওয়া পর্যন্ত।

রাজনৈতিক দলগুলির মুসলিম ভোট-ব্যাঙ্ক অটুট রাখতে নিরপরাধ ভারতবাসী মুসলিম সন্ত্রাসীদের কাছে বলিপ্রদত্ত—এটাই সারকথা। নেতাদের নিরাপত্তা ট্র-দ্ব ক্যাটিগোরিতে উন্নীত হলে কিংবা তারা বুলেট-প্রুফ কিংবা বোমা-প্রুফ ক্যাপসুলে ঢুকে নিরাপদে যাতায়াত করতে পারলেই দেশবাসী নিশ্চিন্ত। তারা কিছুদিন পরপর সন্ত্রাসীদের বোমা-পিস্তলের সহজ শিকার হয়ে শয়ে শয়ে মরুক—এটাই তাদের নিয়তি; এটাই তাদের ভবিতব্য। আর নেতারা সন্তানসন্ততিসহ নিরুদ্বেগে দুধেভাতে থাকুন কিংবা আমেরিকায় পাড়ি দিন। কলকাতার রাস্তায় ১৯৪৬ সালের মতো মুসলিম মস্তানদের নাচানাচিতে তাদের কিছু যায় আসে না।

ভারত-পাকিস্তানে, হিন্দু-মুসলমানে শান্তি ও সৌহার্দ্য স্থাপিত হলে কোরানই মিথ্যা প্রমাণিত হবে যে!

Swastika
29 March - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

মকবুল ফিদার কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ ও কয়েকটি প্রাসঙ্গিক তথ্য

গণেশের মাথায় নগ্ন লক্ষ্মীদেবী।

বস্ত্রাবৃত মকবুল ফিদার মাতৃদেবী।

স্বস্তিকার প্রতিবেদন।। সাম্প্রতিক-কালে সংবাদের শিরোনামে ফের উঠে এসেছেন মকবুল ফিদা হুসেন। তবে এবারে শিরোনামে আসার প্রেক্ষাপটটা শুধু বিগত দেড় দশক ধরে হিন্দুত্বকে নগ্ন করে শিল্পোৎকর্ষতার বাহাদুরি প্রদর্শনের মতো ধৃষ্টতা দেখানোতেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং তার থেকেও গুরুতর কিছু। মকবুল ফিদা এখন কাতারের বাসিন্দা। চুরানব্বই বছর বয়সে তাঁর মনে হয়েছে—তিনি ভারতে ফিরতে চাইলে 'হিন্দুত্ববাদী'রা তাঁকে আক্রমণ করতে পারে। সুতরাং এপথ তাঁর বন্ধ। অন্যদিকে লণ্ডন আর দুবাই—এই দুই জায়গায় থাকার টানাপোড়েন এই বয়সে আর সহ্য হচ্ছে না। অগত্যা এবছরের গোড়াতেই কাতারের নাগরিকত্ব প্রাপ্তি ফিদার। এনিয়ে দেশ-ব্যাপী হই-চইও কম হলো না। কারণ মকবুলের প্রেমে 'ফিদা' হয়ে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের যাবতীয় 'রাজনৈতিক দেউলিয়া'পনা থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র সরাতে তোপ দাগল আর এস এসের ওপর। আর ফিদা হুসেনও এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। তিনি বলে দিলেন যে, দেশের নব্বই শতাংশ মানুষই নাকি তাঁকে চান, বাকি দশ শতাংশ মানুষও রাজনৈতিক নেতারা (পড়ুন সঙ্ঘ-পরিবার) তাঁর বিরুদ্ধে থাকার জন্যই তিনি এদেশের নাগরিকত্ব ছাড়তে বাধ্য হলেন। মকবুল কি ভুলে গেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক গড়ে ওঠা দেশজুড়ে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ? আসলে হিন্দু দেব-দেবীদের নিয়ে অশালীন ছবি আঁকায় পরের পর মামলা হয় তাঁর নামে। আর এই মামলার ভয়েই তিনি হন পগার-পার। যাই হোক, মকবুল

বাঘ ও দেবী দুর্গার সহবাস।

ফিদা হুসেনকে জবাবটা দিয়েছেন আর এস এসের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। তিনি বলেছেন, 'মকবুল ফিদা হুসেন ভারতীয়। উনি ভারতে ফিরতে চাইলে ফিরতেই পারেন। তাঁকে স্বাগত। কিন্তু প্রত্যেক শিল্পীরই একটা মর্যাদা আছে। কেউ সেই মর্যাদাটা অতিক্রম করলে তার ক্ষমা চাওয়া উচিত।

আজ মকবুল ফিদা যখন বলেন, 'ভারত মায়ের চিত্রাঙ্কন করতে পারে কিংবা 'রেপ অব্ ইন্ডিয়া' নাম দিয়ে মুম্বই-এর ২৬/১১-এর ঘটনা তুলে ধরতে পারে তাকে চিত্রকর না বলে জল্লাদ বলাই বোধহয় যুক্তিযুক্ত হবে, আর এগুলোকে যারা শৈল্পিক উৎকর্ষতার অজুহাতে পিঠ-চাপড়াতে চাইছিলেন তাঁদের জ্ঞাতার্থে বলা যাক হজরতের কন্যা ফতিমা, নিজের মাতৃদেবী ও কন্যা কিংবা এক মুসলিম মহিলা অথবা মুসলিম কবি ফৈয়াজ অথবা গালিব—এঁদের কিন্তু তাঁর ক্যানভাসে বস্ত্রাবৃত করেই তুলির টান দিয়েছেন হুসেন।

অন্যদিকে একের পর এক নগ্ন সরস্বতী, মা দুর্গার সঙ্গে বাঘের সহবাস, গণেশ ঠাকুরের মাথায় নগ্ন মা লক্ষ্মী, উলঙ্গ পার্বতী, বিবস্ত্রা দ্রৌপদী, রাবণের নগ্ন উরুদ্বয়ের ওপরে বস্ত্রহীন দেবী সীতা ও উলঙ্গ হনুমানের ছবি আঁকতেও বাঁধেনি তাঁর, শুধু তাই নয়, যেহেতু হিটলার ছিল তাঁর ঘোরতর অপছন্দের তাই নগ্ন হিটলারকে দিয়ে গান্ধীজীর শিরশ্ছেদের মতো কষ্ট কল্পিত ইতিহাস রচনারও প্রয়াস চালিয়ে ছিলেন তিনি। হিন্দু মাত্রই নগ্ন, আর মুসলিম কিংবা খৃষ্টান (মাদার টেরিজাকেও বস্ত্রাবৃত করেই এঁকেছিলেন ইনি) হলেই পোশাক-আবৃত (হুসেনের আঁকা বস্ত্রপরিহিত মুসলিম রাজা ও নগ্ন হিন্দু ব্রাহ্মণের ছবিটি এর সব থেকে বড় এভিডেন্স)—এই নোংরা মনোবৃত্তির মানুষটি ভারতে আসতে চাইলে হয়তো পাসপোর্ট কিংবা ভিসায় আটকাবে না। আটকাবে রুচি-বোধে জাতীয় স্বাভিমানে। ভারতবর্ষের মানুষের মূল্যবোধে।

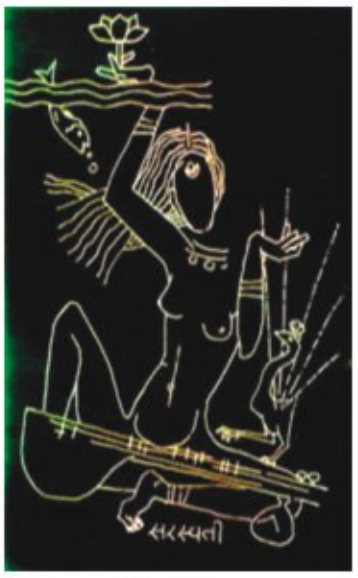

নগ্ন সরস্বতী।

সুন্দর পোষাকে হুসেন কন্যা।

স্বস্তিকা
নববর্ষ সংখ্যার উন্মোচন অনুষ্ঠান
১১ই এপ্রিল, ২০১০, রবিবার সন্ধ্যা ৬টা
স্থান ঃ– কেশব ভবন, ৯এ, অভেদানন্দ রোড, কলকাতা-৬
–ঃ প্রধান বক্তা ঃ–
মাননীয় মধুভাই কুলকর্ণী,
সদস্য, কার্যকারিণী মণ্ডল, আর এস এস

সংশোধনী

গত ২২ মার্চ, ২০১০ সংখ্যায় নববর্ষ সংখ্যার উন্মোচন অনুষ্ঠানের তারিখটি ১২ এপ্রিলের পরিবর্তে ১১ এপ্রিল পড়তে হবে।

প্রকাশিত হবে ১২ এপ্রিল, '১০
স্বস্তিকা
প্রকাশিত হবে ১২ এপ্রিল, '১০
নববর্ষ সংখ্যা - ১৪১৭
মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের ভাষায় হিন্দুত্ব মানে জীবনধারা। ভারতীয় পরম্পরার প্রবাহিত এই ধারা আজ ধর্মনিরপেক্ষতার অক্টোপাশে আবদ্ধ। স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দুমেলার গৌরবগাথা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্বোধিত করলেও আজকের সংবাদ মাধ্যমগুলি হিন্দুবিদ্বেষে সিদ্ধহস্ত। দেশভাগ, অনুপ্রবেশ, ধর্মান্তরকরণ ও সন্ত্রাসী আক্রমণে হিন্দুরা আজ আতঙ্কিত। সীমান্তের পাড়ায় পাড়ায় হিন্দু নিগ্রহ আজ নিত্যদিনের ঘটনা। কেমন রয়েছে পদ্মাপারের হিন্দুরা, প্রবাসে হিন্দুত্ব কিভাবে টিকিয়ে রেখেছে তার অস্তিত্ব। হিন্দুর বিপদ আজ কোথা থেকে—এসব নিয়ে স্বস্তিকার বিশেষ নববর্ষ সংখ্যা।
– লিখেছেন –
মোহনরাও ভাগবত, নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত, তথাগত রায়, দীনেশচন্দ্র সিংহ, প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, নিখিলেশ গুহ, দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, স্বামী যুক্তানন্দ, গূঢ়পুরুষ, শ্যামলেশ দাস, শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল প্রামাণিক, সত্যনারায়ণ মজুমদার, অরিন্দম মুখার্জী, প্রসিত কুমার রায়চৌধুরী, নৃপেন আচার্য প্রমুখ।
।। রঙিন প্রচ্ছদ।। গ্রন্থকারে প্রকাশিত হচ্ছে।। দাম ঃ দশ টাকা।।
২৭ মার্চের মধ্যে এজেন্টরা কপি বুক করুন।

Steelam
EXCLUSIVE FURNITURE
স্টীলম ত্রর .....
পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
Exclusive Show Room
দেওয়া হইবে॥
Factory :- 9732562101

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com